বাবা ও মাকে

মির্জা অসদুল্লা খাঁ গালিব জন্মগ্রহণ করেন ৮ই রজব, ১২১১ হিজরী (১৭৯৭ খ্রীঃ), আগ্রাতে। গালিব উর্দু এবং ফারসীর এক মহান কবি। প্রথমে তিনি ফারসীতেই লিখতেন। পরবর্তীকালে উর্দুর ক্রমবর্ধমান লোকপ্রিয়তার জন্যই বোধহয় ১৮৫০ সাল নাগাদ উর্দুতে লিখতে শুরু করেন।

চিঠিপত্র একবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু লেখার কৌশল, কথন ভঙ্গী, নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি কারণে একটা ব্যক্তিগত বস্তু হয়ে ওঠে সকলের। গালিব ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। শিষ্য, বন্ধুর সংখ্যা অগুণতি। গালিবের চিঠি পড়লেই বোঝা যায় তিনি সেই যুগেও কত আধুনিক ছিলেন।

গালিবের এক শিষ্য চৌধুরী আবদুল গফুর 'সুরুর' তাঁর জীবনাবসানের কয়েক বছর আগে কতকগুলো চিঠি নিয়ে একটি বই করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু গালিব অনুমতি দেন নি। এছাড়া মুন্সী শিবনারায়ণ 'আরাম' এবং মুন্সী হরগোপাল 'তফ্‌তা'ও তাঁর কতকগুলো চিঠি নিয়ে একটি বই করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ২৮ নভেম্বর, ১৮৫৮, গালিব শিবনারায়ণকে একটা চিঠিতে লেখেন, 'উর্দু চিঠিপত্র যা আপনি ছাপাতে চান, তা' এক অর্থহীন ব্যাপার। কেন না কয়েকটা চিঠি আছে যেগুলো আমি কলম সামলে বা হৃদয় দিয়ে লিখেছি। আর বাকি সব স্রেফ আঁকিবুঁকি। কি দরকার আমাদের নিজেদের ব্যাপার পরের ঘাড়ে চাপিয়ে?' কিন্তু গুলাম গৌস খাঁ 'বেখবর' কিভাবে গালিবের কাছ থেকে চিঠিপত্র ছাপাবার অনুমতি পান তা সত্যিই রহস্যে ভরা। 'বেখবর'-এর অনুরোধ মতো গালিব সমস্ত বন্ধু ও শিষ্যদের তাঁর সব চিঠিপত্র 'বেখবর'-কে পাঠাতে বলেন। 'উর্দু-এ-হিন্দ্‌' নামে ১৮৬৮ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রস্তাবিত বইটি প্রকাশিত হয়। ভূমিকা এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মুন্সী মুমতাজ আলি খাঁ।

'উর্দু-এ-হিন্দ্' বাজারে বেরোনোর পর গালিবের অন্যান্য বন্ধুরা তৎপর হ'ন। এবং তাঁদের তৎপরতার ফসল 'উর্দু-এ-মুঅল্লা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে মার্চ মাসে। কিন্তু ১৮৬৯-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী গালিব মারা যান। উর্দু-এ-মুঅল্লার সম্পাদনা করেন মীর মেহেদী মজরুহ। এ ছাড়াও গালিবের কোনো একটা চিঠির উপর রামপুরের মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ বশীর হুসেন জৈদীর দৃষ্টি পড়লেন তাঁর সমস্ত চিঠি জড়ো করতে উপদেশ দেন। পরে এই চিঠিগুলিই একটি বই হয়ে বেরোয়। বইটি নাকি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সাতটি সংস্করণ করতে হয়।

গালিব তাঁর চিঠিতে পারিবারিক অবস্থার কথা, তাঁর বংশ পরিচয়, দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের খুঁটিনাটি বিবৃত করে গেছেন। যেমন একটা চিঠিতে লিখছেন, 'শুধু আজকের দিনের মতোই শরাব আমার কাছে আছে। কাল থেকে ঠাণ্ডা আগুনের পাশে বসে কাটাতে হবে। বোতল-গেলাস সব বরখাস্ত।' খরচের বহরের সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্যহীনতার জন্য আত্মঅভিমানের সুর বাজে অন্য একটা চিঠিতে, 'ইনকামট্যাক্স নেই। চৌকীদার বরখাস্ত। সুদ-মূল, বিবি-বাচ্চা, শিষ্য-বন্ধু বিলকুল বরখাস্ত। আয় সেই একশোবাষট্টি টাকা। বিরক্তি এসে গেছে। দিন কাটান মুশকিল। দিনচর্চাও বন্ধ। ভাবছি কি করি। কি করে কি করা যায়। সকালে অপ্রচলিত ঠাণ্ডা। মাংস মদ গোলাপ সব কিছুই বনধ্। এতে কুড়িবাইশ টাকা মাসে বাঁচে। কয়েকদিনের খরচ চলে যায়। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে, মদ কতদিন আর খাবে না হে? আমি বলি যতদিন মদ আমাকে না খায় ততদিন।'

মাত্র তের বছর বয়সে মির্জা গালিবের বিয়ে হয় নবাব ইলাহী বখ্শ খাঁ মারুফের মেয়ে উমরাও বেগমের সঙ্গে। এক চিঠিতে বেশ মজাদার ঢঙে সেকথা বলেছেন, '৮ই রজব ১২১২ হিজরীতে শাস্তি দিয়ে এখানে পাঠানো হ'ল। তের বছর হাজতে কাটিয়ে ৭ই রজব ১২২৫ হিজরীতে আমার আমৃত্যু কয়েদের কথা ঘোষণা করা হ'ল। আর আমার পায়ে একটি বেড়ী পড়িয়ে দিল্লী শহর নামক কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল। অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে গদ্য, কবিতার ভাবনাও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।' 'তফতা'র এক বন্ধু উমরাও সিং-এর দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গালিবের রসিকতা যেন বাঁধ ভেঙে

যায়। 'তফতা'কে একটা চিঠিতে লিখছেন, 'উমরাও সিং-এর অবস্থায় দয়া হচ্ছে ; আর নিজের জন্য হিংসা। আল্লাহ্, আল্লাহ্, ওর দু'বার বেড়ী কাটা হয়ে গেছে, আর আমি যার গলায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ফাঁসীর দড়ি লাগান আছে —না দড়ি ছিঁড়ছে, না নিঃশ্বাস বন্ধ হচ্ছে।' আর একটা চিঠিতে লিখছেন, 'মহামারীতে মারা তো যেতাম। কিন্তু এই সাধারণ মহামারীতে মরা আমার মনোপুত নয়।' এটা বুঝি তাঁর প্রচ্ছন্ন অভিমানের কথা। যে অভিমান এই দার্শনিক কবি সারাজীবন বুকে পুষে রেখেছিলেন। তাঁর নিজের কোনো সন্তানাদি হয়নি। 'আরিফ'কে তিনি পোষ্যপুত্র নেন। কাঁচা বয়সেই আরিফ মারা যান।

গালিবের চিঠি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দিল্লী শহর, দিল্লী শহরের ভাঙ-চুরের কথা, জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম, আগ্রা শহরের বিস্তৃত সংবাদ, পেনসনের দুশ্চিন্তা, দিল্লীর ঝড়ে বাজার, পাড়া, গলি-ঘিঞ্জি, এমন কি কুঁয়োর জলের অবস্থা থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা, ইংরেজদের অত্যাচার ও সেকালেও যে উত্তেজিত জনতা জেলাশাসককে ঢিল ছুঁড়ে আক্রমণ করেছিল তার কথাও বিস্তৃত জানা যায়।

স্বভাবে প্রফুল্ল ও দরাজ দিলের মানুষ ছিলেন গালিব। বন্ধুদের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করতেন। কখনো উনি হুল্লোড়ে বন্ধু, কখনো নারস উপদেষ্টা, অর্থাৎ এক আদর্শ কবির যা হওয়া উচিত।

অত্যন্ত সুন্দর ও সরস এই সব চিঠি। গালিবের ব্যক্তিত্ব মেজাজ ও চরিত্রকে বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না। গালিবের কবিতা অত্যন্ত উঁচুস্তরের তো বটেই, কিন্তু চিঠির মধ্যে তাঁর গদ্যরীতির পরিচ্ছন্ন সাহিত্যরস উর্দু সাহিত্যে অমর ও উজ্জ্বল হয়ে আছে ও থাকবে।

মুন্সী হবীবুল্লা খাঁ জক্কাকে লেখা চিঠি

[জক্কা ১৮৩০ সালে মাদ্রাজের নেলোর জেলার ত্বগের-এ জন্মগ্রহণ করেন। ফারসীতে গদ্য কবিতার ওস্তাদ ছিলেন। হায়দ্রাবাদে নবাব মুখতারুল মুল্ক সরকারের মুন্সী ছিলেন। ১৮৭৫ সালে মারা যান।]

১

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭। ভাই আমি জানি না তোমার সঙ্গে আমার কেন এত ভালবাসা! হয়ত এটা আধ্যাত্মিক লোকের প্রকাশ। বাহ্যিক কোনো ব্যাপারে এতে অধিকার নেই। রাফকপির পাতাসহ তোমার চিঠির জবাব রওনা হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে পৌঁছাবে।

আমার এখন ৭২ বছর বয়স, বৃদ্ধ হয়ে গেছি। স্মরণশক্তি যেন কখনো ছিলই না। শোনার শক্তি বহুদিন থেকেই নিষ্ক্রিয়। আস্তে আস্তে স্মরণশক্তির মতো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন মাস খানেক ধরে অবস্থা এই, বন্ধুরা আসে যথারীতি মন মেজাজের কথা জিজ্ঞেস করে, কথাবার্তা যা হয় সব কাগজে লিখে। ফলমূল দুষ্প্রাপ্য। বিকালে কন্দ্ ও খোসাছাড়ানো বাদামের শীরা। দুপুরে মাংসের ঝোল। সন্ধ্যেবেলাতে চারটে ভাজা কাবাব। শোওয়ার সময় পাঁচ টাকার মদ আর সেই পরিমাণ গোলাপ। পাপী, অপরাধী, দুরাত্মা! মীর তকী'র এই শেরটা আমার ওপরই প্রযোজ্য—

“মহশূর হ্যাঁয় আলম্ মেঁ মগর হোঁ ভী কঁহি হম্
অলকিস্সা ন দর্ পে হো হমারে কে নহী হম্।”

আজ এসময়ে কিছুটা আরামে ছিলাম। আরও একটা চিঠি লেখা জরুরী ছিল। বাক্স খুলতেই তোমার চিঠি প্রথমেই নজরে পড়ল। পড়ায়

পর বুঝতে পারলাম যে কোনো কোনো শব্দের মানে লেখা হয়নি। নিরুপায়। এখন আবার পৃথকভাবে লিখছি যাতে আমার কথা বিস্তারিত তোমার জ্ঞাত হয়। আমি জাতিতে তুর্কী বংশীয়। আমার ঠাকুর্দা নীলনদের ধারের একটা শহর থেকে শাহ্ আলমের সময় হিন্দুস্থানে আসেন। রাজ্য তখন ভগ্নপ্রায়। শাহ্ আলমের কাছে মাত্র পঞ্চাশ ঘোড়ার অধিনায়কের চাকরী পান। একটা পরগণা অশ্বারোহী বাহিনীর বেতন স্বরূপ পান। ওঁর মৃত্যুর পর দেশের অবস্থা উচ্ছৃঙ্খলার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং সর্বকিছু চলে যায়। আমার বাবা আবদুল্লা বেগ খাঁ বাহাদুর লক্ষ্ণৌ গিয়ে নবাব আসফুদ্দৌল্লার চাকরী নেন। কিছুদিন পর হায়দ্রাবাদ গিয়ে নবাব নিজাম আলী খাঁর কাছে চাকরি নেন। তিনশো ঘোড়ার অধিনায়কের কাজে বহাল হন। কয়েক বছর ওখানে থাকেন। সে চাকরী দেশের এক গৃহযুদ্ধে চলে যায়। বাবা ঘাবড়ে গিয়ে অলওর যান। রাও রাজা বক্তোয়ার সিং-এর অধীনে চাকরী নেন। ওখানে কোনো এক লড়াইতে মারা যান। আমার কাকা নসরুল্লা বেগ খাঁ মারাঠাদের তরফে আকবরাবাদে সুবেদার ছিলেন। উনি আমাকে লালন পালন করেছেন। ১৮০৬-এ জেনারেল লেক্ সাহেবের জমানা আসে। সুবেদারী কমিশনারিতে পরিবর্তিত হয়। এক ইংরেজ সাহেব কমিশনার হন। জেনারেল লেক্ সাহেব আমার কাকাকে অশ্বারোহী বাহিনীতে নেবার আদেশ দেন। চারশো অশ্বারোহীর বিগ্রেডিয়ার হন।

এক হাজার টাকার সম্পত্তি, জীবদ্দশায় লাখ দেড় লাখ টাকা বছরের, এছাড়া সারা বছরের সর্দারী ছিল কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। ঘোড়সওয়ারের চাকরী চলে যায়। সম্পত্তির পরিবর্তে নগদ দেওয়া স্থির হয়। সেটা এখনো পর্যন্ত পাচ্ছি। যখন আমার বয়স পাঁচ বছর, বাবা মারা যান। আট বছর যখন বয়স কাকা মারা যান। ১৮৩০-এ কলকাতা গিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন করি। আমার অবস্থার কথা জানানো হয়। সাত টুকরো কাপড়, পাগড়ী এবং মোতির হার এই তিন রকম রাজবস্ত্র হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়। এরপর যখনই দিল্লীতে দরবার হয়েছে আমাকে এই রাজবস্ত্রই দেওয়া হয়েছে। গদরের পর, বাহাদুর শাহের সঙ্গে মেলামেশার

অপরাধে দরবার ও রাজবস্ত্র দুই-ই বন্ধ হয়ে যায়। আমি নির্দোষ প্রমাণের জন্য দরখাস্ত করা হয়। তদন্ত হতে থাকে। তিন বছর পর ঝামেলা মেটে। এখন সাধারণ রাজবস্ত্র পাচ্ছি। রাজ্যের জন্য। সেবার পরিবর্তে নয়। পুরস্কারও নয়। ভুল ধারণা করেছি। সন্দিগ্ধচিত্ত নই। যাকে বুঝে গেছি তার মধ্যে আর পার্থক্য হবে না। বন্ধুর কাছে কোনো কথা গোপন করি না। কোনো একজন হায়দ্রাবাদ থেকে নামহীন চিঠি ডাকে পাঠিয়েছে। খুব খারাপভাবে মুখটা এঁটে ছিল। খুলতে গিয়ে লাইন কেটে গেছে। অবশ্য চিঠির অর্থ হাত থেকে বেরিয়ে যায়নি। তুমি আমাকে মনে প্রাণে ভালবাস জেনে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস আমার আরো বেড়ে গেল। ওই চিঠিটা এখন একই অবস্থায় মুখ বন্ধ করে পাঠাচ্ছি। এই চিঠির লেখককে চিনে ফেলে কদাপি ওর সঙ্গে ঝগড়া করো না। এটা পাঠানোর উদ্দেশ্য এই যে তোমার উন্নতি, পদ এবং বেতন বৃদ্ধির কথা এই চিঠি থেকেই আমি জেনেছি।

২

বন্ধু ওগো, বন্ধু আমার, মিত্র আমার, প্রিয়! তুমি কি জানো, আগে ছিলাম দুর্বল, এখন অর্দ্ধমৃত? আগে কানে কালা ছিলাম, এখন প্রায় অন্ধ। রামপুর সফরের যাত্রী, কম্পন এবং দুর্বল দৃষ্টি, চার লাইন লিখতেই আঙুল বেঁকে যায়। অক্ষর চেনা যায় না। একাত্তর বছর ধরে বেঁচে আছি। অনেক বাঁচলাম। এখন জীবন বছরের নয়, মাসের নয় মাত্র কয়েকটা দিনের। তোমার প্রথম চিঠি পৌঁচেছে। এ থেকে তোমার অসুস্থতার কথা জানলাম। তোমার দ্বিতীয় চিঠিও গজলসহ এল। গজলগুলো দেখলাম। সব শের

ভাল এবং মজার। স্মরণ শক্তির অবস্থা এই যে, গজলের পৃষ্টভূমি মনে নেই, এটুকু মনে আছে যে একটা শের-এ কয়েকটা শব্দ বদলে গেছে। যাই হোক ঐ গজলগুলো দেখার পর তোমাকে পাঠানো হয়েছে। সুস্থ হওয়ার শুভ খবর জল্দী পাঠাও। কাল একটা রেজস্ট্রী চিঠি এল, এল যেন অশুভ নক্ষত্র। আবার কি ব্যাপার বাবা? খুলে দেখি চিঠিতে রোগ ভাল হওয়ার শুভ সমাচার। সুস্থতার কোনো কথা নেই। ভ্রান্ত অভিযোগে পরিপূর্ণ।

সাহেব, আমার নামের চিঠি যেখান থেকে রওনা হয়েছে সেখানেই যদি রয়ে যায় তো যেতে পারে। নতুবা দিল্লীর ডাকঘরে পৌঁছে চিঠির এমন ঔদ্ধত্য কোথায় যে আমার কাছে পৌঁছাবে না! এখানকার ডাকবিভাগের কর্মচারীদের ব্যাপার, যার নামে চিঠি তাকে দেবে কি না দেবে।

তুমি মির্জা সাবিরের জীবনস্মৃতি চাচ্ছো, গদরের আগে ছাপা হয়েছিল আর গদরের সময় বরবাদ হয়ে গেছে। এখন একটা কপিও কোথাও নজরে পড়ে না। ব্যস্, এখন আমার এইটুকু লেখা বাকা। এই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার ও তোমার কুশল সমাচার জল্দী জানাও। উত্তরের আশায়।

১২ই মে, ১৮৬৭ গালিব

মুন্সী হরগোপাল তফ্‌তাকে লেখা চিঠি

[মুন্সী হরগোপাল তফ্‌তা সেকেন্দ্রাবাদের মানুষ। পিতার নাম মোতিলাল ভাটনগর। ১৭৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে মারা যান। কানুনগোর চাকরী করার ফাঁকে ফাঁকে ফারসীতে সাহিত্যরচনা করতেন। সেকালের অত্যন্ত শক্তিশালী কবি। গালিবের প্রিয় শিষ্য। শেখ সাদির বিখ্যাত বই গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর পাল্টা বই লেখেন।]

৩

মুন্সী সাহেব,

তোমার চিঠি সেদিন অর্থাৎ কাল বুধবার পৌঁচেছে। আমি চারদিন থেকে কম্প রোগে ব্যস্ত। আর মজাটা হচ্ছে যেদিন থেকে কম্প আরম্ভ হয়েছে খাবার খাইনি। আজ শুক্রবার পঞ্চমদিন। না দিনে খাবার জুটেছে, না রাত্রে শরাব। মেজাজে উত্তাপ আছে নিরুপায় হয়ে বিরত থাকছি। ভাই মজাটা দেখ আজ পঞ্চমদিনে খাবার খেলাম। খিদেও পায়নি আর মনটাও ফলমূলের প্রতি উদাসীন। তোমার নামে তো বাবু-সাহেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চিঠিতে দেখলাম। আর বান্দা কষ্টের জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কষ্ট করে কেন? আর যদি মোটের ওপর ওঁর মর্জি হয় তো ভাল। আমি তো আজ্ঞাকারী। আগের কবিতাগুলো আমার কাছে জমা। ভাল হওয়ার পর ওগুলো দেখবো এবং তোমাকে পাঠিয়ে দেব। এই ক'টা লাইন অত্যন্ত কষ্ট করে লিখলাম।

২রা মার্চ, ১৮৫৪ — অসদুল্লা

৪

নাও সাহেব,

খিচুড়ী খেয়ে দিন কাটিয়ে, কাপড় ছিঁড়ে ঘরে এলাম।

৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার ঈশ্বরের ইর্ধা নিয়ে নিজের ঘরে নামলাম। তোমার দুঃখ ভরা চিঠি আমি রামপুরে পেয়েছি। উত্তর দেবার সময় পাইনি। মুরাদাবাদে পৌঁছে অসুখে পড়ি। পাঁচদিন সভাপতিসাহেবের ঘরে পড়ে থাকি। উনি যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেছেন।

পোশাক ত্যাগ করছ কেন হে? পরার আছেটাই বা কি তোমার কাছে, যা ছেড়ে ফেলবে? পোশাক ত্যাগ করলেই তো আর জীবন বন্ধন কাটছে না। না খেয়ে পরে তো জীবন কাটবে না। সুখ-অসুখ, কষ্ট-আরাম সমান করে দাও, সমান ভাবে কাটাও।

তাব্ লায়েংগা বনেগী গালিব
ওয়াকিয়া সখ্ত হ্যায় আওর জান্ অজীজ।

চিঠির উত্তরের আশায়

গালিব।

৫

"রাখিয়ো গালিব মুঝে ইস্ তলখ-নওয়াঈমেঁ মুআফ
আজ কুছ্ দর্দ মেরে দিল মেঁ সিওয়া হোতা হ্যায়।"

বান্দাপরবর,

প্রথমে তোমাকে লেখা হচ্ছে যে, আমার বন্ধু মীর মুর্করম্ হুসেন সাহেবকে সেলাম জানাবে আর বলো এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছি আর এ

থেকে বেশী কিছু আমার সম্পর্কে আমিও জানিনা। মির্জা হাতিম আলি মেহেরকে আমার সেলাম।

তোমার প্রথম চিঠির উত্তর পাঠিয়েছি কি তার দু-চারদিন পর দ্বিতীয় চিঠি হাজির। শোনো সাহেব, যে মানুষ যে কাজে আনন্দ পায় আর নিঃসঙ্কোচে জীবন কাটায় তার নাম বিলাসিতা। আর ভাই এই যে তোমার কাব্য করা এতে আমিও তো বিখ্যাত! আমার অবস্থা এই, এখন যে কবিতা পাঠের কৌশল তাতে আগের পড়া কবিতা সব ভুলে গেছি। কিন্তু হ্যাঁ, নিজের উর্দু কবিতার দেড়শো শের অর্থাৎ এক মক্তা আর একটা মিসরা মনে আছে। সুতরাং মন যখন বারবার উথাল-পাথাল করে তখন পাঁচ দশ বার এই লাইন দুটো ঠোঁটে এসে যায়—

"জিন্দগী অপনী জব্ ইস শক্ল সে গুজরী গালিব
হম্ ভী ক্যায়া য়াদ করেঙ্গে কি খুদা রখতে থে।"

তারপর যখন পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ি তখন এই লাইনটা পড়ে চুপ হয়ে যাই—"এ মর্গে-নাগহাঁ! তুঝে ক্যায়া ইন্তজার হ্যায়?"

এ কেউ বোঝে না যে আমি নিজের ঔজ্জ্বল্যহীনতায় এবং শেষ হয়ে যাওয়ার দুঃখে মরছি। আমার যা দুঃখ তার ব্যাখ্যা তো জানি তাই ঐ ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করছি। ইংরেজদের মধ্যে যারা এই কলঙ্কিত কেলোদের হাতে খতম হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ আমার প্রত্যাশী ছিল, কেউ বন্ধু, কেউ আমার মিত্র, কেউ আমার শিষ্য। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে কিছু প্রিয়জন, কিছু বন্ধু, কিছু শিষ্য, কিছু প্রেমিকা। সব কে সব মাটিতে মিশে গেছে। এক প্রিয়জনের শোক কত কঠিন! আর যে এত প্রিয়জনের শোক পায় তার বেঁচে থাকাটা কঠিন কিনা বলো? এত বন্ধু মরেছে যে, যদি এখন আমি মরি তাহলে আমার জন্য কাঁদার কেউ থাকবে না।

তলখ নওয়াঈ—কটু বচন। সিওয়া—অধিক। মর্গে নাগহাঁ—অনায়াস মৃত্যু।

৬

ভাই,

তোমার আমার মধ্যে তো সংবাদ লেখকের ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে কথোপকথন। আজ সকালে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছি আর এখন তোমার একটা চিঠি এসে হাজির। শোনো সাহেব, 'মীম, হে, মীম, দাল' এর প্রতিটি অক্ষরে আমার জান্ দিতে পারি, কিন্তু যদিও এখান থেকে বিলাতের সরকার পর্যন্ত এই শব্দ অর্থাৎ মুহম্মদ অসদুল্লা খাঁ লেখা হয় না তাই আমিও বরখাস্ত করে দিয়েছি। থাকল মির্জা ও মৌলানা, নব্বাব। এতে তোমার ভাই এর অধিকার আছে যা ইচ্ছে লেখ। ভাইকে বলো চিঠির উত্তর সকালে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মির্জা তফ্‌তা, এখন তুমি বই-এর মলাটের সাজ-সজ্জার জন্য ভাইপো সাদাতমন্দ্‌কে কষ্ট দিও না। মৌলানা মেহরের অধিকারে, যা ইচ্ছে করুক।

চিঠি শেষ করে মনে পড়ল মির্জা সাহেবের কাছে যা আশাকরি তা তোমার কাছেও ব্যক্ত করি। সাহেব, ওখানে 'আফতাব-এ আলমতাব' নামে একটা সংবাদপত্র বেরোয়। ওর ব্যবস্থাপক, এক দেড় পাতা দিল্লীর বাদশাহের কথা লেখার ব্যবস্থা করেছে, কে জানে কোন্ মাস থেকে শুরু হবে। যাই হোক হকীম অহসনুল্লা খাঁ চাচ্ছেন যে, আগের যেসব পৃষ্ঠা ছাপাখানায় পড়ে আছে সেগুলোর নকল কোনো নকলনবীশকে দিয়ে করিয়ে এখানে পাঠানো হোক। এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে (১৮৫৮) ওর নাম গ্রাহকদের তালিকায় লেখা হোক। দু'সপ্তাহে দুটো সংখ্যা একটা প্যাকেটে পাঠানো হোক। পারিশ্রমিক যা উল্লেখ করবে তাই পাঠানো হবে। এবং তারপর প্রতিমাসে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওকে সংবাদপত্রের প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া হোক। এটা আমি জনাব মির্জা হাতিম আলি সাহেবকে লিখেছি। এখনো পর্যন্ত কিছু জানান নি। না খাম হকীম সাহেবের কাছে পৌঁচেছে, না ওই পৃষ্ঠাগুলোর নকল আমার কাছে এসেছে।

এতে তোমার চেষ্টা নিশ্চয়ই আছে, আর হ্যাঁ সাহেব, 'আফতাব-আলমতাব'এর ছাপাখানা তো কাশ্মিরী বাজারে কিন্তু তুমি জানাও এই অধমের ছাপাখানা কোথায়? অদ্ভুত ব্যাপার এই বন্ধুমহোদয় আমার চিঠির জবাব দেয়নি! হকীম অহ্‌সানউল্লা খাঁ'র অনুরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা হলে আমার সেলাম জানিয়ে তার উত্তর আর ওই সংবাদপত্র ওঁর মাধ্যমে পাঠাও।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮

৭

কি সাহেব,

অভিমান করেই থাকবে, নাকি অভিমান ভঙ্গ করবে? যখন কোনো রকমেই মান ভাঙবে না তখন অভিমানের কারণ জানাও। আমি এই একাকীত্বে শুধু চিঠির ভরসা নিয়ে বেঁচে আছি। অর্থাৎ যার চিঠি এল ধরে নিলাম সে নিজেই এল! ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে কোনোদিন এমন যায় নি দুচারটে চিঠি না এসেছে। উপরন্তু এমন দিনও হয়েছে যে ডাক-হরকরা দুবার ডাক নিয়ে এসেছে। দু'একটা সকালে, দু'একটা বিকেলে। আমার মন খুশী হয়ে ওঠে। ওগুলো পড়তে আর জবাব লিখতেই দিন কেটে যায়। দশ বারো দিন থেকে তোমার চিঠি আসছে না। অর্থাৎ তুমি আসছ না। কারণ কি? চিঠি লেখ সাহেব, না লিখলে তার কারণ লেখ। আধআনার কৃপণতা করো না। যদি তাই হয় তাহলে বিয়ারিং চিঠিই পাঠাও।

সোমবার ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৫৮ গালিব

৮

দেখ সাহেব,

এসব ব্যাপার আমার পছন্দ নয়। ১৮৫৮ সালের চিঠির জবাব ১৮৫৯ সালে পাঠাচ্ছো? আর মজা হচ্ছে, যখনই তোমাকে বলা হবে তখনই তুমি বলবে যে, আমি পরের দিনই জবাব দিয়েছি। মজার মজাটা কি জানো? আমিও সাচ্চা তুমিও সাচ্চা, আজ পর্যন্ত রায় উমেদ সিং এখানেই আছেন এখন আর যাবেন না। তোমার উদ্দেশ্য তো সফল হয়েছে। যেদিন উনি এসেছিলেন সেই দিনই আমাকে বলে গেছিলেন। আমি ভুলে গেছিলাম আর তোমাকে আগের চিঠিতে লিখিনি। সাহেব, ওর ইচ্ছে মতো আমি মির্জা তফ্‌তার দীওয়ানের কয়েকটা কপি এবং 'তজমীন-এ আশআর-এ গুলিস্তঁা'র কয়েকটা কপি এক পারসীকে যে বোম্বাই থাকে, পাঠিয়ে দিয়েছি। দৃঢ়বিশ্বাস সে ইরাণে পাঠাবে। উমেদ সিং ওই পারসীর নামটাও বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি। এখন এ-ব্যাপারে তোমাকে চিন্তায় ব্যস্ত দেখে ওর কথা আমার মনে পড়ল। উনি কোথায় জানি, দুবার ওর ঘরেও গেছি। কিন্তু মহল্লার নামটা জানিনা, আমার লোকেদের মধ্যেও কেউ জানে না। যে জানতে পারে তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে তোমাকে লিখে পাঠাব।

মীর বাদশাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে আমার দুয়া জানাবে।

৩রা জানুয়ারী।

৯

মির্জা তফ্তা,

তুমি যা লিখেছ তা নিষ্ঠুর এবং সন্দেহজনক। তোমার ওপর সব অসন্তোষ ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমার গর্ব হিন্দুস্থানে আমার এক প্রকৃত বন্ধু আছে। যার নাম হরগোপাল, 'তফ্তা' তার উপনাম। তুমি কি এমন কথা লিখবে যা দুঃখের কারণ হবে? চুগলি খোরের কথা ছাড়ো। তার অবস্থা কি জানো? আমার এক ভাই ছিল, আপন ভাই, সে ত্রিশ বছর ধরে পাগল; অবশ্য মারা গেছে। যদি সে বেঁচে থাকত আর তোমার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করত—আমি কিন্তু ধমকে দিতাম। অসন্তুষ্ট হতাম।

ভাই, আমার আর কিছু বাকী নাই। বর্ষার বিপদ কেটে গেছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের গতি বেড়েছে। সারাদিন পড়ে থাকি, বসতে পারি না। প্রায় শুয়ে শুয়ে লিখি। আমি নিশ্চিত যে তোমার অনুশীলন এখন পাকা হয়ে গেছে, সংশোধনের মুখাপেক্ষী নও: এর থেকে বড় কথা কসীদাগুলো সব প্রেমপূর্ণ আমদানীর সহায়ক নয়।

যাই হোক কোনো এক সময় দেখে নেব, তাড়াতাড়ি কি আছে? তিনটে কথা জমা হয়েছে—আমার অসুস্থতা, তোমার কবিতার সংশোধনের মুখাপেক্ষী না হওয়া, কোনো কসীদা থেকে কোনো রকম লাভের কল্পনা না করা। কাগজ সামনেই পড়ে আছে।

ধৈর্য্যহীন বাল মুকুন্দের একটা পাঁশেল এসেছে অনেকদিন হ'ল, আজ পর্যন্ত খুলিনি। নবাব সাহেবের দশ পনেরটা গজল পড়ে আছে।

"জোফ্ নে গালিব নিকম্মা কর্ দিয়া
ওরনা হম্ভী আদমী থে কাম কে।"

তোমার কবিতা কাল এসেছে। আজ এখনো সূর্য গরম হয়নি। সব দেখলাম। খামে ভরে লোকের হাত দিয়ে ডাকঘর পাঠালাম।

২৭শে নভেম্বর, ১৮৬২। গালিব

৮

দেখ সাহেব,

এসব ব্যাপার আমার পছন্দ নয়। ১৮৫৮ সালের চিঠির জবাব ১৮৫৯ সালে পাঠাচ্ছো? আর মজা হচ্ছে, যখনই তোমাকে বলা হবে তখনই তুমি বলবে যে, আমি পরের দিনই জবাব দিয়েছি। মজার মজাটা কি জানো? আমিও সাচ্চা তুমিও সাচ্চা, আজ পর্যন্ত রায় উমেদ সিং এখানেই আছেন এখন আর যাবেন না। তোমার উদ্দেশ্য তো সফল হয়েছে। যেদিন উনি এসেছিলেন সেই দিনই আমাকে বলে গেছিলেন। আমি ভুলে গেছিলাম আর তোমাকে আগের চিঠিতে লিখিনি। সাহেব, ওর ইচ্ছে মতো আমি মির্জা তফ্‌তার দীওয়ানের কয়েকটা কপি এবং 'তজমীন-এ আশআর-এ গুলিস্তাঁ'র কয়েকটা কপি এক পারসীকে যে বোম্বাই থাকে, পাঠিয়ে দিয়েছি। দৃঢ়বিশ্বাস সে ইরাণে পাঠাবে। উমেদ সিং ওই পারসীর নামটাও বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি। এখন এ-ব্যাপারে তোমাকে চিন্তায় ব্যস্ত দেখে ওর কথা আমার মনে পড়ল. উনি কোথায় জানি, দুবার ওর ঘরেও গেছি। কিন্তু মহল্লার নামটা জানিনা, আমার লোকেদের মধ্যেও কেউ জানে না। যে জানতে পারে তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে তোমাকে লিখে পাঠাব।

মীর বাদশাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে আমার দুয়া জানাবে।

৩রা জানুয়ারী।

৯

মির্জা তফ্‌তা,

তুমি যা লিখেছ তা নিষ্ঠুর এবং সন্দেহজনক। তোমার ওপর সব অসন্তোষ ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমার গর্ব হিন্দুস্থানে আমার এক প্রকৃত বন্ধু আছে। যার নাম হরগোপাল, 'তফ্‌তা' তার উপনাম। তুমি কি এমন কথা লিখবে যা দুঃখের কারণ হবে? চুগলি খোরের কথা ছাড়ো। তার অবস্থা কি জানো? আমার এক ভাই ছিল, আপন ভাই, সে ত্রিশ বছর ধরে পাগল; অবশ্য মারা গেছে। যদি সে বেঁচে থাকত আর তোমার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করত—আমি কিন্তু ধমকে দিতাম। অসন্তুষ্ট হতাম।

ভাই, আমার আর কিছু বাকী নাই। বর্ষার বিপদ কেটে গেছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের গতি বেড়েছে। সারাদিন পড়ে থাকি, বসতে পারি না। প্রায় শুয়ে শুয়ে লিখি। আমি নিশ্চিত যে তোমার অনুশীলন এখন পাকা হয়ে গেছে, সংশোধনের মুখাপেক্ষী নও। এর থেকে বড় কথা কসীদাগুলো সব প্রেমপূর্ণ আমদানীর সহায়ক নয়।

যাই হোক কোনো এক সময় দেখে নেব, তাড়াতাড়ি কি আছে? তিনটে কথা জমা হয়েছে—আমার অসুস্থতা, তোমার কবিতার সংশোধনের মুখাপেক্ষী না হওয়া, কোনো কসীদা থেকে কোনো রকম লাভের কল্পনা না করা। কাগজ সামনেই পড়ে আছে।

ধৈর্য্যহীন বাল মুকুন্দের একটা পার্শেল এসেছে অনেকদিন হ'ল, আজ পর্যন্ত খুলিনি। নবাব সাহেবের দশ পনেরটা গজল পড়ে আছে।

"জোফ্‌ নে গালিব নিকম্মা কর্ দিয়া
ওরনা হম্‌ভী আদমী থে কাম কে।"

তোমার কবিতা কাল এসেছে। আজ এখনো সূর্য গরম হয়নি। সব দেখলাম। খামে ভরে লোকের হাত দিয়ে ডাকঘর পাঠালাম।

২৭শে নভেম্বর, ১৮৬২। গালিব

১০

ভাই,

এইমাত্র তোমার চিঠি এসে পৌঁছাল। পড়েই উত্তর দিচ্ছি। তিন বছরের জমা টাকা তিন হাজার হ'ল কোত্থেকে? বছরে সাতশো পঞ্চাশ টাকা পেয়ে থাকি। হিসেব মতো তিন বছরে দু হাজার দুশো পঞ্চাশ হয়। একশো টাকা অগ্রিম পেয়েছিলাম। ওটা কাটা গেছে। দেড়শো বিভিন্ন খাতে খরচা হয়েছে। থাকল দু হাজার টাকা। মীর মুখ্‌তার একজন মহাজন আর আমি ওর পুরোনো ঋণী। ঐ দু' হাজারের ঋণটাই নিজের কাছে রেখে দিয়েছে এবং আমাকে বললো, "আমার হিসেবটা করুন।" সুদেমূলে সাত কম পনের হয়েছে ওর। খুচরো ধারের হিসাব ওকে দিয়েই করালাম। এগারোশো কিছু টাকা হ'ল। পনেরশো আর এগারোশো ছাব্বিশশো হয়। অর্থাৎ দু হাজারে ছ'শো'র ঘাটা। ও বললো, "পনেরশো আমাকে দিয়ে দাও। বাকী পাঁচশো সাত টাকা তুমি নিয়ে নাও।" আমি বললাম, "খুচরো এগারোশো মিটিয়ে দিই, ন'শো বাকী থাক্।" আধা তুই নে আধা আমাকে দে! গত পরশু, চার তারিখে টাকা নিয়ে এসেছে। কাল পর্যন্ত ঝামেলা মেটেনি। আমি তড়িঘড়ি করছি না। দু একজন মহাজন মাঝেও আছে। এ হপ্তার মধ্যে ঝামেলা মিটে যাবে। খোদা করুন এই চিঠি তোমার হাতে যেন পৌঁছায়। আর বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরে এসে আমাকে তোমার শুভাগমনের খবর দিও।

৬ই মে, ১৮৬০ গালিব

সৈয়দ ইউস্থফ মির্জাকে লেখা চিঠি

[নবাব হুসামুদ্দীন হৈদর খাঁর নাতি। পিতা ছিলেন বিদ্রোহী। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে বান্দাতে ধরা পড়েন এবং ফাঁসী হয়। ইউস্থফ মির্জা অলবরের মহারাজার মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পেতেন। গালিবের স্নেহধন্য ছিলেন। ১৮৮২-৮৩ সালে লক্ষ্ণৌতে মারা যান।]

১১

সৈয়দ ইউস্থফ মির্জা,

আমার অবস্থা খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। মানুষ দুঃখে বেকুফ হয়ে যায়, বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। যদি এই দুঃখের ভীড়ে আমার মানসিক শক্তি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই বরং এটা না হওয়াটাই অবিশ্বাস্য। যদি বলো দুঃখটা কি? তাহলে শোনো, মৃত্যুর দুঃখ। বিরহের দুঃখ। পেন্সনের দুঃখ। সম্মানের দুঃখ। মৃত্যুর দুঃখ বিষয়ে গোটা শহরটাকেই ধরছি। মজ্জফরুদ্দৌলা, মীর নসারুদ্দীন, মির্জা আশুর বেগ, আমার ভাগ্নে, তার ছেলে আহম্মদ মির্জা, উনিশ বছরের ছেলে আজমুদ্দৌলা তার দুই ছেলে অর্তজা খাঁ এবং মুর্তজা খাঁ, কাজী ফৈজউল্লা এদের কি আমি প্রিয়জন মনে করতাম না? সে কি ভুলে গেছ? হায়! হায়! হকীম রজীউদ্দীন খাঁ, মীর আহম্মদ হুসেন মৈকশ, হায় আল্লাহ! এদের এখন কোথেকে আনব?

বিরহের দুঃখ—হুসেন মির্জা, ইউস্থফ মির্জা, মীর মেহেদী, মীর সরফরাজ হুসেন, মীরণ সাহেব আল্লাহ এদের শতায়ু দিন। ঘর অপ্রদীপ, ভবঘুরে। সাজ্জাদ এবং আকবরের কথা কল্পনা করলেই হৃদয়বিদীর্ণ হয়ে যায়। সাধারণের মতো বলতে তো এরকম সবাই পারে কিন্তু আমি আলীর শপথ নিয়ে বলছি সেই মৃত্যুর দুঃখে এবং প্রিয়জনদের বিরহে সারা সংসার আমার

কাছে অন্ধকারময়। আমার এক ভাই দীবানা মারা গেল। তার মেয়ে তার চারটে বাচ্চা. তাদের মা অর্থাৎ আমার বৌদি জয়পুরে পড়ে আছে। এই তিন বছরে ওদের একটা টাকাও পাঠাতে পারিনি। ভাইঝি আমার কি বলবে! আমার এক চাচা আছে, এখানে সুখী মানুষ। ধনী লোকেদের বৌ ছেলেমেয়েরা ভিক্ষে করে বেড়াবে আর আমি তা দুচোখ ভরে দেখব! এ ধরণের অঘটন দেখতে গেলে বুকের পাটা থাকা দরকার। এখন নিজের ভাগ্যের ওপর বিলাপ করি। একটা বিবি, দুই বাচ্চা, ঘরের তিন চারজন কল্লু, কল্‌হান, অয়াজ এরা বাইরের।

মিয়াঁ ঘম্মন মাস কয়েক আগে এসেছে ক্ষিধের জ্বালায়। আচ্ছা ভাই, তুমিই বলো একটা পয়সা আমদানী নেই, বিশ আদমী খানেওয়ালা। এক মানুষ খাটতে খাটতে বেহাল। দিন রাতের মধ্যে বিশ্রাম নেই। শুধু একটা ব্যাপার ঘুরে ফিরে আসে, মানুষই তো, দেব দেবতা বা ভূত প্রেত তো নই যে আশ্চর্য কিছু করে ফেলতে পারব! এইসব দুঃখ সহ্য কি করে করি বলো? বার্ধক্যটাই তো একটা কঠিন রোগ। এখন আমাকে দেখলে বুঝতে আমার অবস্থাটা। কি চেহারা হয়েছে! নেহাতই দু চার মিনিট বসি নয়ত পড়ে থাকি, যেন কঠিন রোগী। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কেউ আসেও না। সেই ঘাম যা শক্তি এবং সম্মানের প্রতীক ছিল আজকাল তাও নেই। সবচেয়ে বড় ঝামেলা আমদানীর, সরকারী আমদানীর ঝামেলা। আগে দরবারে যেতাম, মান সম্মান পেতাম, সে সব আর নেই। না সফল, না ব্যর্থ, না আমি অপরাধী, না নিরপরাধী, না নোংরা একজন লোক, না গুপ্তচর। ভাই তুমিই বলো যদি এখানে দরবার হয় এবং আমাকে ডাকা হয় তাহলে কোন্ মুখে যাব? দুমাস দিনরাত বুকের রক্ত ঝরিয়ে একটা কসীদার চৌষট্টি লাইন লিখেছি। অনেকটা রক্ত গেল হে এই বুড়ো মানুষটার। চিত্রকর মুহম্মদ ফজলকে দিয়ে দিয়েছি, পয়লা ডিসেম্বর আমাকে দেবে।

বুঝলে মিয়াঁ, তোমাকে আর একটা খবর দিচ্ছি। ব্রহ্মার ছেলে দুদিন অসুস্থ থেকে তিনদিনের মাথায় মারা গেল। হায়! হায়! ছেলেটা অত্যন্ত নিরীহ এবং সৎ ছিল হে! ওর বাবা শিউজীরাম ওর দুঃখে একটা

মৃত লাশের থেকে বিচ্ছিরী যদি কিছু থাকে তাই হয়ে গেছে। আমার এই দুজন সাথী কমে গেল। একজন মৃত, একজন ভগ্ন হৃদয়। তোমার সেলাম কাকে জানাব? এই চিঠিটা তোমার মামুকে পড়াবে, ওর কাছ থেকে নিয়ে একে একে পড়ে নিও। ওর মতামত না নিয়ে উঠবে না এবং এইসব আবেদনের জবাব তাড়াতাড়ি দিও। জিয়াউদ্দীন খাঁ রোহতক চলে গেছে। সে কাজ শেষ না করেই চলে গেছে। দেখ এসে কি বলে? হয়ত রাত্রে এসে গেছে বা সন্ধ্যের মধ্যে এসে যাবে। কি করি? কার হৃদয়ে হৃদয় মেলাই? প্রথম থেকেই ঠিক করা আছে যে অওধের শাহর কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে, ভাগ করে নেব। অর্ধেক হুসেন মির্জা এবং তুমি ও সাজ্জাদ। অর্ধেক গরীবদের জীবনের জন্য।

গালিব

১১

ইউসুফ মির্জা, কিভাবে তোমাকে লিখি যে তোমার আব্বাজান মারা গেলেন? এবং যদি লিখিই তারপর কি লিখব? এখন কি করবে? সান্ত্বনা, সবুর; আরে ভাই, এ সব পৃথিবীর পুরোনো কৌশল। প্রিয়জনের মৃত্যুতে এইভাবেই শোক প্রকাশ করতে হয়। এই বলে ধৈর্য্য হারিও না। হায়! একজনের হৃৎপিণ্ড কেটে বাদ দেওয়া হ'ল আর লোকে বলে কি কাঁদিস না, ধৈর্য্য ধর! কেন, কেন, কাঁদবে না সে? আমি এ পরামর্শ দিই না ভাই। দুয়ার ওপর অধিকার নেই। ওষুধের কথা কি আর বলি? প্রথমে ছেলে মরল তারপর বাবা, যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মাথা এবং পা নেই এমন কে আছে?' আমি ইউসুফ মির্জাকে দেখিয়ে দেব।

তোমার দাদী লিখেছেন চলে যাওয়ার হুকুম হয়ে গেছে, তাই তিনি চলে গেলেন। কথাটা সত্যিই। যদি সত্যিই হয় তাহলে বলব বীরপুরুষ একসঙ্গে দুটো কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেলেন। না থাকল জীবন বন্ধন না ইংরেজের কয়েদখানা। হ্যাঁ সাহেব, উনি লিখেছেন, পেন্সনের টাকাটা পাওয়া গেছিল সেটা মৃতের কাজে লেগেছে। এটা কি রকম কথা! শুধু আসামী হয়েই ১৪ বছর জেলে থেকেছেন! তাঁর পেন্সন কিভাবে পাওয়া যাবে এবং কার দরখাস্তে পাওয়া যাবে? রসিদ কার কাছে নেওয়া হবে? মুস্তাফা খাঁ-র রেহাই-এর আদেশ হয়েছে কিন্তু পেন্সন বন্ধ। যদিও এসব খোঁজখবর বেকার কিন্তু এটা তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তোমার মনে যা আসবে আমাকে লিখবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে উনি চালাক, কথায় পটু এবং রসিক লোক ছিলেন। ভেবেছিলেন যে এইসব করেই ফাঁকি দিয়ে চলে যাবেন। অটল বিশ্বাস কার কবে বদলায়? যদি তাই-ই হয়, তাহলে তাঁর অহংকার ভুল ছিল। এ ভাবে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।

আমার ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। তোমার দাদীর চিঠি যেটা তোমার ভাই আমাকে পাঠিয়েছিল, সেটা আমি তোমার মামুকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার আদেশ হয়ে গেছে, যদি তার বড় ভাই-এর বন্ধু তা ছাড়ে। দেখ শেষ পর্যন্ত কি হয়। মুজফ্‌ফর মির্জাকে দুয়া। তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি। তোমার চাচার আরম্ভটা তো ভালই। খোদা করুন আরম্ভের মতোই যেন শেষ হয়। ওঁর মোকদ্দমা দেখে তোমার ফুফীর এবং তোমার ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কি হচ্ছে, কি হবে, সম্পত্তি পেলেও পাওনাদারদের শোধ দিতে হবে। আসল অন্নদাতা পেন্সন মঞ্জুর করুন তাহলে খাওয়াটা জুটবে। মীর কুরবান আলী সাহেবকে আমার সেলাম, মীর কাশেম আলিকে আমার দুয়া।

গালিব

১৩

কেউ আছো হে? ইউসুফ মির্জাকে একটু ডাকো তো। ও, সাহেব এসে গেছ। মির্যা, আমি কাল তোমাকে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু তোমার একটা প্রশ্নের উত্তর থেকে গেছে এখন শুনে নাও। তফজ্জুল হুসেন খাঁ নিজের মামু মুয়ুউদ্দীন খাঁ'র কাছে মেরঠে আছেন। দিল্লী এসে থাকবেন কিন্তু আমার কাছে আসেননি। ওঁর বাবা গুলাম আলি খাঁ আকবরাবাদে আছেন, মাস্টারি করেন, ছেলে পড়িয়ে পেটের রুটি জোটান।

তুমি লিখেছ যে, ওয়াজিদ আলি শাহের 'পচ্চাশমহল' কলকাতা গেছেন। তোমার মামু মুহম্মদ কুলী খাঁ চিঠিতে লিখেছেন অওধের শাহ বেনারস এসে গেছেন। ওই খবরের সঙ্গে এই খবরের লাভ নেই। ওদিক থেকে তুমি বেনারস গিয়ে এদিক থেকে বেগমদের ওখানে আনিয়েছ। কিন্তু মেরিজান্, আমার কি?

১৮৫৬

১৪

মির্যা,

তোমার চিঠি রামপুরে গিয়ে আবার রামপুর থেকে দিল্লী এসেছে। আমি ২৯শে শাহবান রামপুর থেকে রওনা দিই এবং ৩০শে শাহবান দিল্লী এসে পৌঁছাই। সেদিনই রমজানের চাঁদ হয়েছে। রবিবার রমজানের পয়লা, আজ সোমবার ৯ই রমজান। অর্থাৎ ন' দিন হ'ল এখানে আমার আসা।

আমি হুসেন মির্জা সাহেবকে রামপুর থেকে লিখেছিলাম যে, আমি না আসা পর্যন্ত ইউসুফ মির্জাকে আলওর যেতে দিও না। এখন ওর কথা থেকে জানতে পারলাম যে তোমার রওনা হওয়ার পর আমার সে চিঠি পৌঁচেছে। তুমি যে তোমার মামুর মোকদ্দমার ব্যাপারে লিখেছ, আমি কি ওর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক নই? যদি খোদার মর্জি হয় তাহলে কোনো না কোনো একটা উপায় হবে। এখন তুমি বলো, কবে নাগাদ আসছ? শুধু তোমাকে দেখার জন্য বলছি না। হয়ত তোমার আসার পর কিছু কাজও করা যাবে। মুজফ্‌ফর মির্জার এবং হুমশীরা সাহেবার আসা এমন কিছু জরুরী নয়। হয়ত পরে প্রয়োজন হবে। যাই হোক, যা হবার বুঝে নেওয়া যাবে। তুমি চলে এস। স্নেহের হুমশীরাকে আমার দুয়া জানাবে। মুজফ্‌ফর মির্জাকে আমার দুয়া। ভাই তোমার চিঠি রামপুর পৌঁছালেও এদিকে আসার চিন্তায় উত্তর দিতে পারিনি।

বখ্‌শী সাহেবদের ঘটনা এই যে, আগা সুলতান পাঞ্জাব গেছেন। জগরাঁউতে মুন্সী রজুব আলির অতিথি হয়েছেন। সফরে সুলতান ও ইউসুফ সুলতান ওখানে আছেন। নবাব মেহেদী আলি খাঁ কিছু কিছু খবরাখবর নিয়ে থাকেন। সুলেখক মীর জলালুদ্দীন আর ওরা দু'ভাই পরস্পর এক সঙ্গে থাকেন। আমিও ওখানে ছিলাম। তখন সফদর সুলতান দিল্লী এসেছিলেন। যখন এখানে এলাম, শুনলাম উনি মেরঠ গেছেন। খোদা জানেন রামপুর যাবেন নাকি অন্য কোথাও রওনা দেবেন।

ছেলেরা আমাকে খুবই জ্বালাতন করছিল। নয়ত আরো কিছুদিন রামপুরে থাকতাম। বিশেষ আর কি লিখি।

২রা এপ্রিল, ১৮৬০ গালিব

১৫

মির্জা আলাউদ্দীন আহমদ খাঁ অলাঈকে লেখা চিঠি

[লোহারুর নবাব রহমত বখ্‌শের নাতি। পরে লোহারুর নবাবও হন। গালিবের প্রিয় শিষ্য, গালিবের সঙ্গে আত্মীয়তাও ছিল। অলাঈ নিজেকে গালিবের উত্তরাধিকারীও বলতেন। ১৮৮৪ সালে মারা যান]

সুভান আল্লাহ্‌, দীর্ঘদিন না খবর, না চিঠি! তারপর যদি এল একেবারে ভুল। তুমি আমার কাছে চেয়ে আনা বইটা চাচ্ছ? মনে করো তো তোমাকে আগেই লিখেছিলাম যে 'দসাতীর' এবং 'বুরহান-কাতে' ছাড়া আর কোনো বই আমার কাছে নেই। শপথ নিয়ে বলছি 'বুরহান-কাতে' তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। 'দসাতীর' আমার প্রাণ-ভোমরা, রক্ষাকবচ। টাটকা কবিতা চাচ্ছ? দেব কোত্থেকে? প্রেমের কবিতা? ও আমার শত্রু। যেরকম শত্রুতা ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। সরকার বাহাদুরের কবি ছিলাম। কাব্য করতাম, রাজবস্ত্র পেতাম। এখন রাজবস্ত্রও বন্ধ। আমিও বরখাস্ত। না গজল, না প্রশংসা। নিন্দনীয় ও অশ্লীল কবিতা আমার দ্বারা হবে না ভাই। তাহলে বলো কি লিখব? বুড়ো পালোয়ান কি আর প্যাঁচ দেখাবো? চারিদিক থেকে কবিতা আসে, সংশোধন করি। বিশ্বাস করো এটাই ঘটনা। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। তুমি একবার এখানে এস। হায়! মজিদের বাবার সঙ্গে গিয়ে যদি তোমাকে দেখে আসতাম। উর্দু'র দীওয়ান রামপুর থেকে নিয়ে এসেছি। সেটা এখন আগ্রায়। ওখানে ছাপা হবে। একটা কপি তোমার কাছেও যাবে—

"তুম্‌ জানো তুম্‌ কো গৈর সে রস্‌ম ও রাহ্‌ হো
মুঝকো ভী পুছতে রহো তো ক্যায়া গুণাহ্‌ হো?"

তুমি যার সঙ্গে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করো, কিন্তু কখনো সখনো আমার অবস্থাটা জিজ্ঞেস করলে কি অপরাধটা হবে?

২রা জুলাই, ১৮৬০ — গালিব

পাছে উনি আমাকে ভুল বোঝেন। মোটকথা এই কথাবার্তায় মুন্সী সাহেব একটা লাইন নিজের প্রশংসায় বাড়িয়ে নিয়েছেন।

আপনি ওঁকে আমার সেলাম জানাবেন এবং বলবেন আমি ওঁর ওপর রাগ করিনি। আমি চাই উনি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং আমাকে তার সেবক ভাবুন। আপনার পাঠানো রুবাঈগুলো আমার কাছে মজুত। সংশোধনের পর পাঠিয়ে দেব। চিন্তা না করে নিশ্চিন্তে থাকুন।

অসদুল্লা।

১৮

বন্ধু আমার! মিত্র আমার! দয়ালু আমার! তোমার একটা চিঠির উত্তরের ঋণ আমার উপর আছে। কি করি, দারুন কষ্ট, বিষণ্ণ থাকি সবসময়। এ শহরে বাস করা আমার বরদাস্ত হচ্ছে না। এত বাধা ছড়িয়ে পড়েছে যে বেরোতে পারি না। মোটকথা আমি এখন শুধু মরার অপেক্ষায় বেঁচে আছি।

"মুনহসির মর নে পে হো জিসকী উম্মীদ
না উম্মীদী উসকী দেখা চাহিয়ে।"

আজ এই দুঃখ কষ্টের ভীড়ে তোমার এবং তোমার বাচ্চাদের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন হ'ল না তোমার কোনো খবর পেয়েছি না প্রিয় ভাইঝি জাকিয়ার। না মুন্সী আব্দুল লতীফ না নসীরুদ্দিনের খবর। তোমার জন্য প্রার্থনা করি, প্রশংসা করি। যাইহোক ছেলেপুলেদের দুয়া জানাবে। আর যদি মৌলানা ভক্‌তা থাকে তাহলে তাকে সেলাম জানাবে এবং বলো তোমার এই কাজের দু-একটা অংশ দেখেছি, দুঃখের ভীড়ে আর দেখার অবসর পাইনি।

১০ই জানুয়ারী, ১৮৫০ অসদুল্লা।

১৯

ভাই সাহেব,

অপরাধী বান্দা হাজির এবং সে বন্দেগী জানাচ্ছে। দোষের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তোমার দুটো চিঠি এসেছে, উত্তর দিতে পারিনি। শেখ ওজীরুদ্দীন কারণটা নিশ্চয়ই বলে থাকবে। আসল বস্তু হচ্ছে, আমার আর তোমার রক্ত এক। ওখানে যখন তীব্র উত্তাপ তখন এখানে কিভাবে তার প্রভাব না পড়ে? দীর্ঘদিন ধরে পায়ের ঘায়ে ভুগলাম। ছোট ছোট দানা পায়ের তলায় বাসা নিয়েছিল। যেমন কোনো নীচু জাতের মধ্যে হঠাৎ করে একজন নামধাম করে ফেলে সেরকম একটা ফুস্কুড়ি ওই গুলোর মধ্যে বড় হয়ে পেকে গিয়ে ঘা হয়ে যায়। প্রায় হাড়ের ওপর। অনুমান করো তো অবস্থাটা কি হতে পারে? ঈদের দিন বাদশাহের সঙ্গে ঈদ্‌গাহে যেতে পারিনি। পরের দিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ঈদের ভেট দিয়ে এসেছি। অবশেষে জ্বর ও প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ব্যাথা জ্বর কি বলি, দশবারো দিন সমান অবস্থা। মলম লাগানো হয়েছিল। ফোড়া পেকে গিয়ে ফেটেছে। এক গাদা পুঁজ বেরোয়, দু আঙ্গুলের মত গর্ত্ত হয়ে গেছিল। এখন ক্ষত ভাল হয়ে গেছে, দু চার দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাব। জ্বরটা তার অস্থায়ী বাসা ছেড়ে যাচ্ছে।

২০

ভাই সাহেবকে সেলাম এবং মুন্সী আব্দুল লতীফ, নসীরুদ্দীন এবং স্নেহের জাকিয়ার জন্য দুয়া। আরক্ পান করে যান হজরত। ঘাবড়াবেন না। দেখবেন কি উপকারটা করে। আমার তো উপকার হয়েছে। আমার

বিশ্বাস আপনারও উপকার হবে। সেবকের পালন কর্তা! মোরব্বা এবং আচার দু'টোই আছে। খোদা হুজুরকে কুশলে রাখুন। যখন ইচ্ছা চেয়ে নেব। কিন্তু পাঠাই কিভাবে? ডাকে? ও আর বলবেন না। যদি মাটির পাত্রে বা টিনে রেখে পাঠান, নিশ্চিত ভাবে উল্টাসিধা হয়ে যাবে। যদি মোরব্বা হয় তাহলে তার রস আর আচার হলে তেল পড়ে যাবে।

যাই হোক, আচার মোরব্বার থেকেও ভাল বস্তু নিয়ে এসেছি। আমার কাছে রাখা আছে। যে রকম হুকুম করবেন সেই ভাবেই পাঠিয়ে দেব।

হজরত কালে সাহেব এবং মিয়াঁ নিজামুদ্দীন এবং ভাই গুলাম হুসেন খাঁ, তুর্‌রাবাজ খাঁ, মুগল খাঁ এবং আর সব সাহেব সেলাম জানিয়েছে। জৈনুল আবেদীন খাঁ ভাল আছে। ওর বিবি কিছুটা ফুরসত পেতে চলেছে। রোগের অবস্থা আর বিপদজনক নয়, খোদার কৃপায় সুস্থ হয়ে যাবে। ভাই, খোদার দোহাই, হুসন আলী বেগকে এটুকু বুঝিয়ে বলো যে একটা মেয়ের জন্য নিজের বিবিকে ছেড়ে দিয়েছে এটা কি রকম! তোমার মা-ও ওর কথা জিজ্ঞেস করেন না। সে বেচারী নিজের মাসীর কাছে পড়ে রয়েছে। নিজের মাকে লেখ যে, পুত্রবধূকে মানিয়ে নিয়ে আসুন এবং তোমার কাছে পাঠিয়ে দিন। অর্থাৎ এই পরামর্শ তুমি মির্জাকে দাও এবং খুব করে বলো।

১৮৫১

২১

ভাই সাহেবকে সেলাম। ভাই আলীবখ্‌শ খাঁ এবং ভাই তুর্‌রাবাজ খাঁ, মির্জা জৈনুল আবেদীন খাঁ এবং অন্যান্য বন্ধুদের সেলাম জানাচ্ছি আর নাতি হওয়ার জন্য অভিনন্দন। তার দীর্ঘায়ু এবং চিরসুখী জীবনের জন্য

দুয়া জানাচ্ছি। আমার বিবি তোমার বিবিকে সেলাম, বৌমাকে দুয়া জানাচ্ছে। আর তোমাকে, তোমার বিবিকে, তোমার ছেলেমেয়েকে মুবারক জানাচ্ছে। জাকিয়াকে ভালবাসা আর নসীরুদ্দীনকে দুয়া—এ সমস্তই তোমার চিঠির জবাবে। তুমি যে লিখেছিলে, আমার ঘরণীর তরফে সেলাম এবং ছেলেদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা, এটা তারই প্রতি-উত্তর। এই উত্তর বা এই সমস্ত ভাই-বন্ধুদের সেলাম এবং গুণগান কয়েকদিন থেকে আমার কাছে জমা ছিল। আজ শুক্রবার দুপুর বেলা কিছুটা সময় পেতেই আমি লিখে ফেললাম, যদি বেঁচে থাকি তাহলে কাল সকালের ডাকে এই চিঠি পাঠিয়ে দেব। তুমি শেখ ইকরামউদ্দীন ওরফে আব্দুল সলামকে লিখেছ, আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ ওকে কুশলে রাখুন। উচ্চপদ দেব। বাপ-ঠাকুরদার নাম উজ্জ্বল করুক। বংশের গৌরব বৃদ্ধি হোক।

মির্জা হুসন আলি বেগ একদিন আমার কাছে এসেছিল। বলছিল যে, 'মুন্সী সাহেবের ইচ্ছা তুই কোলে আয়।' আমি বললাম, 'সাহেব, এখন যাওয়ার দিন নয়। যদি খোদার মর্জি হয় তাহলে আমের সময় কোল এবং মারহরে যাব।' মারহরের পীরজাদার ছেলে এসেছিল। আমি ওকেও বলে দিয়েছি যে, বর্ষার সময় কোলে যাব। যদি ভাই অনুমতি দেয় তাহলে মারহরেও যাব।

ভাই, তুমি সেই পৃষ্ঠাগুলো হারিয়ে দিয়েছ। এখন আমি কি করি! যদি ওগুলো তোমার কাছে থাকত তাহলে আমার একটা টান থাকত। আর আমি পরিশ্রম সাপেক্ষে যা কিছু এখন লিখছি সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম। যখন আমি দেখলাম যে তোমার ইচ্ছা নেই, মনমরা হয়ে গেলাম। যাই হোক এ তো গেল ঠাট্টার ব্যাপার। এখন তুমি ওই পৃষ্ঠাগুলো ওখান থেকে চেয়ো না। আমি হজরত হুমায়ুনের সমস্ত কথা লিখেছি। এখন নতুন ভাবে কোনো নকলনবীশকে দিয়ে লিখিয়ে তোমাকে পাঠাব, নিশ্চিন্ত থেক। আমীর তৈমুর থেকে অধস্তন চারপুরুষ বাবর পর্যন্ত এমন ভাবে কেটেছে যাতে সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়নি। তৈমুর, বাবর, হুমায়ুন

কোল—আলিগড়ের পুরানো নাম।

এই তিন উৎসাহী সম্রাটদের কথা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখেছি। এখন হজরত আকবর শাহের কথা শুরু করব। নৌরোজের ঝামেলা এবং কবিতার চিন্তা ছিল। এই জন্ত গত্তের দিকে লক্ষ্য দিতে পারিনি। এখন হু'চার দিন দম নিয়ে হৈ হৈ করে আকবর শাহের কথা লিখতে শুরু করব। তোমার জন্ত ভাল নকলনবীশকে দিয়ে লেখাচ্ছি। চিন্তা করো না। তফ্‌তার কথা তুমিও লিখেছিলে আর ওঁর চিঠিও এসেছে। জানলাম সে কৌল থেকে আকবরাবাদ গেছে। নাচ গান রং শরাব আর কাবাবে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

সাহেব জানী বাঁকেলালের কিছু কবিতা তফ্‌তা আমার কাছে পাঠিয়েছে এবং ওঁর একটা চিঠি। অর্থাৎ জানীজী-র চিঠি আকবরাবাদ থেকে তফ্‌তার মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে। যাই হোক, পত্তগত্তের ব্যাপারে এই মানুষটি বড় সংযত। আমি ওঁকে এতটা জানতাম না।

তুমি ওর কাছ থেকে পৃষ্ঠাগুলো দাবী করো না। আমি তোমার জন্ত আরো কিছু পাঠাচ্ছি।

১৮ই মার্চ, ১৮৫১ অসদুল্লা

২২

ভাই সাহেব,

এর আগে হুটো চিঠি তোমাকে দিয়েছি। একটা ডাকে আর একটা হুকিম ইলাহী বখ্‌শের হাতে। কাল আমি কেল্লা থেকে আসছিলাম রাস্তায় হুসন আলি বেগের সঙ্গে দেখা। উনি বললেন, 'আমি কাল যাব' অর্থাৎ আজ। তুমি তো জানো কাল বৃহস্পতিবার ছিল ২৯শে রজব, ২০শে মে— আর আজ শুক্রবার।

যাই হোক, কাল রাত্রে মোরব্বা মাটির পাত্রে রেখে ওটাকে মোম

মাখানো কাপড় দিয়ে বন্ধ করে কল্লুর হাত দিয়ে মির্জার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন মির্জা সাহেবের ওপর নির্ভর করছে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা নিয়ে যাবেন। বান্দা এখন কর্তব্য মুক্ত।

তৈমুরের বংশধরদের ইতিহাস লেখা চলছে। এখন ঘটনা হচ্ছে যে, কোনো অংশ লেখা হয়ে গেলে আমার কাছে আসছে। আমি ওর মার্জিনে শব্দকোষের অর্থ লিখে যাচ্ছি। যাই হোক তিনটে অংশ লিখে ফেলেছি অর্থাৎ লিখিত তিনটে অংশ আমার কাছে এসে গেছে এবং আমি মার্জিনে লিখে ফেলেছি। যখন সব এসে যাবে তখন আমি পার্শেল করে পাঠাব। ছোটমাত্রা দেখতে ভাল কিন্তু লাইনটানা কাগজে এগারো লাইন লেখা হচ্ছে। এগারো বারোটা অংশ হবে। মনে হয় আর দুই তৃতীয়াংশের মতো লেখা বাকি। খোদা করুন দ্রুত শেষ হোক, আমার সমস্ত লজ্জা দূর হয় তাহলে।

জোওয়ালা সিং দু'বার আমার কাছে এসেছে। আমি চিঠি লিখে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছি যে, সে হচ্ছে এই এলাকার মামলাকারীদের স্মরণস্থল। যদি প্রয়োজন হয় এবং জোওয়ালা সিং বলে তাহলে আমি ওকে মৌলবী সাহেবেরও সামনে হাজির করব। তুমি আমাকে হকিম ইলাহী বখ্শের কথা জানাও, সে তো তোমার সঙ্গে দেখা করেছে এবং সেকেন্দ্রাও গেছে।

তফ্তার খবর কি? ওখানেই আছে না আকবরাবাদ গেছে। আমার মন বলছে আজ বিকেলের মধ্যে তোমার চিঠি আমার কাছে এসে যাবে। প্রায় এমন হয় যে, সকালে আমি চিঠি ডাকে পাঠিয়েছি আর বিকেলে ডাকহরকরা তোমার চিঠি এনে দিয়েছে। এখানে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসেও প্রত্যেকদিন বৃষ্টি হচ্ছে এবং বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে। লোকে রাত্রে কম্বল ঢাকা দেয় আর আমি লেপ। ন'দিন থেকে একই জিনিস দেখছি যে দিনরাত মেঘ জল ঢালছে আর ঠাণ্ডা বাড়ছে। দু'দিন গরম পড়ে তো তৃতীয় দিন মেঘ, আবার দু'চারদিন বৃষ্টি। তুমিও জানাও তোমাদের ওদিকের খবর কি।

তুমি হয়ত শুনে থাকবে যে মোমিন খাঁ মারা গেছেন, আজ দশদিন হ'ল। দেখ ভাই, আমাদের ছেলেপুলেরা মারা যাচ্ছে, সমবয়সীরা মারা যাচ্ছে, কাফিলা চলে যাচ্ছে আর আমি রেকাবের ওপর পা দিয়ে বসে আছি। মোমিন খাঁ আমার সমসাময়িক ছিলেন, বন্ধুও। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর হ'ল অর্থাৎ চোদ্দ পনের বছর বয়স থেকে আমার আর পরলোকগত মোমিন খাঁ'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো কোনোরকম ঝগড়া বিবাদ হয়নি। হজরত, চল্লিশ বছর তো দুষমণীও হয় না বন্ধুত্বের কথা তো দূর! এই মানুষটা নিজের জন্যই ভাল ছিলেন, অদ্ভুত ওঁর মন ছিল।

আজ তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাই কথা বলছি, চিঠি লিখছি না তো! কিন্তু আফশোষ এই কথাবার্তায় সেই মজা নেই যা পরস্পরের কথায় থাকে: অর্থাৎ আমিই বকবক করে যাচ্ছি তুমি কিছু বলছ না। সে জিনিস কোথায় যে আমার কথার জবাব তুমি দিয়ে যাও আর তোমার কথার জবাব আমি। কি করি বলো, অদ্ভুত এক জীবন-যাপন করছি। আমার অবস্থাটা এখন সম্পূর্ণ আমার মন-বিরুদ্ধ। আমি তো চাই চলে ফিরে ঘুরে বেড়াই। একমাস এখানে তো দু'মাস ওখানে। ব্যাপারটা যেন হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি, যেন কক্ষনো আর নড়াচড়া করতে পারব না। কাগজ শেষ হয়ে গেল। এখনো অনেক কথা বাকি। এই চিঠিতে এখনো আমি ছেলেপুলেদের দুয়া জানাইনি। ভাই তুমিই বলে দিও তোমার চিঠিতে ওদের কুশল সংবাদ দিও।

২১ শে মে, ১৮৫২ শুক্রবার।

২৩

ভাই সাহেবের কৃপাপত্র পৌঁচেছে। তোমার হাথরস থেকে কোন আসা আগেই শুনেছি। আমার এক বন্ধু ওই জেলায় থাকে। আল্লাহ্ ওকে বাঁচিয়ে রাখুন।

গরমের কথা জিজ্ঞেস করছো? এই ষাট বছর বয়সের মধ্যে এই রকম লু আর রোদ, এই তাপ দেখিনি। ছ'সাত রমজান খুব বৃষ্টি হয়েছে। এরকম মেঘও জ্যৈষ্ঠ মাসে কখনো দেখিনি। এখন মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেলেও আকাশ ঘিরে থাকে, হাওয়া চললে গরম থাকে না কিন্তু গেলেই মহাবিপদ। রোদ তীক্ষ্ণ। রোজা রাখছি, কিন্তু রোজাকে তুষ্ট করে রাখছি। কখনো জল খেয়ে নিচ্ছি, কখনো হুঁকো টানছি, কখনো কয়েক টুকরো রুটি খেয়ে নিচ্ছি। এখানকার লোকেদের অদ্ভুত ধারণা এবং অদ্ভুত কলাকৌশল। আমি তো রোজা তুষ্ট করে যাচ্ছি আর এই মহাশয়েরা বলছেন যে তুই রোজা রাখছিস না। এটা বোঝে না যে রোজা রাখা এক জিনিস আর রোজাকে তুষ্ট করা আর এক জিনিস।

জয়পুরের অবস্থা তুমি মুন্সী সাহেবের কথায়, ওঁর নামের চিঠি দেখে জেনেছ, দ্বিতীয়বার আর লিখি কেন? যাই হোক যথেষ্ট হয়েছে। কি এমন কর্তব্য ছিল, যা আমি চাইতাম তাই হতে পারত!

হ্যাঁ ভাই, পরশু কেউ আমাকে বললো যে দিল্লী উর্দু সংবাদপত্রে নাকি লিখেছে হাথরসে হাঙ্গামা হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেট আহত হয়েছেন। আজ আমি এক বন্ধুর ওখান থেকে এই কাগজের দুটো পাতা এনে দেখলাম। লিখেছে যে, রাস্তা চওড়া করার জন্য ঘরবাড়ী এবং দোকান ভেঙে ফেলার জন্য হাঙ্গামা হয়েছে। জনসাধারণ পাথর ছোঁড়ে, ম্যাজিস্ট্রেট আহত হন। অবাক হচ্ছি, যদি এই রকমই হয়ে থাকে তাহলে সাহেব ওখান থেকে চলে কেন এলেন। আর হাকিম যদি না আসেন তাহলে তিনি এলেন কি ভাবে? পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা করছি যে তুমি ঘটনাটা বিস্তারিত লিখবে।

২২শে জুন, ১৮৫৩

২৪

ভাই সাহেব,

আমিও তোমার সহদুখী হয়ে গেলাম অর্থাৎ মঙ্গলবার ১৮ রবীউল আওয়াল বিকেল বেলায় সেই পিসিমা, যাকে আমি ছোটবেলা থেকেই মা বলে জানতাম আর উনিও আমাকে নিজের ছেলে মনে করতেন, মারা গেলেন। তুমি জেনে রাখ যে, গত পরশু একসঙ্গে ন'জন লোক মারা গেলেন : তিন পিসিমা, তিনজন চাচা, একজন বাপ। এক দাদী, দাদু। বুঝতে পারলে কিছু? অর্থাৎ ঐ পিসিমার বেঁচে থাকার মধ্যে ঐ ন'জনও বেঁচে ছিলেন। আর উনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলাম আজ সকলেই মৃত।

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ অসদুল্লা

২৫

ভাই সাহেব,

পরশু বিকেলে মির্জা ইউসুফ আলী খাঁ শহরে পৌঁচেছে এবং কাল আমার কাছে আসে। বেগম তো পর্দার আড়ালের লোক; ঘরে অনেকেই অসুস্থ। আর তারপর ওদের জন্য তোমার ওপর সহানুভূতি আর বিকেলে কবিদের জমা হওয়ার কথা সব বলেছে। অবাক হচ্ছি মেঘ চতুর্দিকে জল ঢালছে তবুও এত রোগজ্বালা কেন? এখানেও প্রায় লোক জ্বর-জ্বালায় ব্যস্ত। ঈশ্বর যেন শেষটা ভাল করেন এবং বান্দাদের ওপর কৃপা করেন।

আগের চিঠিতে লিখেছি যে, রোগীদের সুস্থতার খবর দ্রুত দেবে। মনে

হয় কোনো না কোনো ঝামেলায় জন্য তোমার চিঠি এখনো পর্যন্ত আসছে না।

হকিম ইলাহী বখ্‌শ সেকেন্দ্রাবাদী তোমার কাছে পৌঁচেছে। অত্যন্ত সৎ ও কাজের লোক। ওঁর ভরণপোষনের খেয়াল রাখবে আর শেখ রহমতউল্লা সাহেব যিনি তোমার দৌলতেই সফল হয়েছেন। যদি ওখানে থাকেন তাহলে ওঁকেও একটু দেখ। আমার সেলাম জানাবে আর যদি ওখানে না থাকেন তাহলে ওঁর ব্যাপারে বিস্তারিত জানাও।

মির্জা ইউসুফ আলি খাঁ বলছিলেন যে, তুমি সেই কসীদাগুলো চাচ্ছ, যেগুলো শোককাব্য ধরণের লেখা হয়েছিল আর সেখানে অওধের শাহের প্রশংসাও আছে। যদি হাতে এসে যায় তাহলে ছাপা, আর না হলে লিখে পাঠিয়ে দেব। বাদশাহ অওধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। যদি আর কিছু মনে আসে তাহলে সেটাও তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বেগমকে দুয়া জানাবে। কি ভাই, এখন আমি কোল গেলেও তোমাকে দেখব কিভাবে? তোমার দেশে কি ভাইঝিরাও চাচার কাছে পর্দা করে? ভাই, খোদার দোহাই সবার কুশল সংবাদ তাড়াতাড়ি দিও। মুন্সী হরগোপালের চিঠিতে এইটুকু জানলাম যে, মিয়াঁ আব্দুল লতীফের ঘরে সবাই ভাল আছে। অন্যান্যদের খবর জানতে পারিনি।

১৫ই আগস্ট, ১৮৫৪ — অসদুল্লা

২৬

ভাই সাহেব,

কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। আল্লাহ্ আব্দুল সলামের মাকে সুস্থ করে তুলুন। আর ওঁর ছেলেপুলেদের ওপর কৃপা করুন। এই জ্বর আর

কাশি যদি পুরোনো হয়ে যায় তাহলে এটা অসুস্থতা নয়, একেবারে রোগ। এই ধরণের রোগী বহুদিন থাকে। আর যদি ভাগ্য ভাল হয় সুস্থও হয়ে যায়। কলসুমকে মায়ের দুধ খাইয়ো না। দাই রাখ। রোগিণীরও আরাম হবে, আর মেয়েও রেহাই পাবে।

আমাকে দেখ, জয়নুল আবেদীন আর ওর বিবি মরল, দুটো বাচ্চা রেখে। ওদের মধ্যে একটাকে আমি নিয়েছি। বাড়িয়ে বলছি না, আজ তের দিন হ'ল হুসেন আলী চোখ খোলেনি, দিন রাত জ্বর, অজ্ঞান ও অচৈতন্য। কাল বারো দিনের মাথায়, জোলাপ দিয়েছিলাম। চারবার দাস্ত হয়েছে। দু চার বার ওষুধ ও এক দু'বার বার্লির জলে টিঁকে আছে, ফলাফল খুব ভাল দেখছি না। ওর দাদীও অসুস্থ। প্রতিদিন দুপুরে কাঁপুনি শুরু হয়। দিনের শেষে বন্ধ হয়। জহরের নামাজ পড়া হয় না কিন্তু অসরের নামাজ ঠিক সময়েই পড়ে নেয়। মজা হচ্ছে দু'জনেরই জ্বর একই রকমের। ভাই, বিবির জন্য এত চিন্তা নেই। কিন্তু হুসেন আলীর রোগ আমাকে মেরে ফেলল। ও যে আমার বুকের ধন, খোদা ওকে বাঁচিয়ে তুলুন। দরকার হলে আমি এই দুনিয়া ছেড়ে যাব। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বেচারা। আমি আগে তোমাকে লিখিনি। এখানে রোগ খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে। সাধারণ রোগ নয়—জ্বর। ভীষণ জ্বর। ঘরে যদি দশজন লোক থাকে তাহলে ছ'জন থাকে অসুস্থ আর চারজন সুস্থ, আর এই ছ'জনের মধ্যে তিনজন সুস্থ হয়ে যেতেই ওরা চারজন বিছানা নেবে। রোগ জ্বালা যাই থাক না কেন এখন লোক মরতে শুরু করেছে যে! বাতাসে বিষ জন্মেছে।

"রাত দিন গর্দিশ মেঁ হ্যায় সাত আসমাঁ।
হো রহেগা কুছ্ না কুছ্ ঘাবড়ায়ে ক্যায়া।"

দুঃসময় সারা আকাশ চক্কর কাটছে। না জানে কখন কি বিপদ নেমে আসে। কিন্তু এখন সেই বিপদের আশঙ্কায় ঘাবড়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই। কিছু না কিছু তো হবেই।

আচ্ছা, ডাকবিভাগ এ রকম বিগড়ে গেল কেন হে? আমি নিজের খামখেয়াল বশবর্তী হয়ে সাবধানতাবশতঃ বিয়ারিং চিঠি পাঠানো অভ্যাস

করেছিলাম। চিঠি যখন ডাক ঘরে যেত রশিদ পাওয়া যেত। পোস্ট-অফিসের লাল সিল, বিয়ারিং-এর কালো সিল, নিশ্চিন্ত থাকতাম। ডাকবই দেখে মনে পড়ে যেত যে অমুক চিঠি কবে পাঠিয়েছি, কিভাবে পাঠিয়েছি। এখন ডাকঘরে মুখ খোলা একটা বাক্স লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কোনো চিঠি ওতে ফেলে চলে এস। না রশিদ না মিল না নিরাক্ষণ। খোদা জানেন ওই চিঠি যাবে কিনা? যদি রওনাও হয় তারপরেও প্রশ্ন থাকে যে ওখানে পৌঁছাবার পর ডাকহরকরার ইনামের লোভ না সরকারের উসুল করার লোলুপতা থাকবে। কে জানে হরকরাকে দেওয়া হবে কিনা বা হরকরা পৌঁছে দেবে কিনা? যদি চিঠি না পৌঁছায় তাহলে প্রেরক কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে দাবী করবে? তবে হ্যাঁ, চার আনা দিয়ে রেজিস্ট্রী করা যেতে পারে। আমি দু তিন দিন অন্তর নানা জায়গায় চিঠি দিয়ে থাকি। আট আনা, এক টাকার রেজিস্ট্রী কোত্থেকে পাব? কখনো কখনো আমি তিন মাষে মনে করে আধ আনার স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিই। সে চিঠির ওজন দু'রত্তি বেশী হয়ে যায়। যার নামে চিঠি তার কাছ থেকে দ্বিগুণ উসুল করা হয়েছে। খামোখা কাঁটা-কাঁটার ঝামেলা। বেশী যা হবে তা আলাদা, ওজনের আলাদা। চিঠি পাঠানো হ'ল না। একটা ঝগড়া হয়ে গেল। এ এক বিপদ হ'ল। আজ দশই মহরম চিঠিটা লিখছি। কাল স্ট্যাম্প আনাব। খামের ওপর লাগিয়ে রওনা করে দেব। অন্ধকার কুঠরীর তীর লাগল তো লাগল, না লাগল, না লাগল।

খোদার দোহাই, এই চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি দিও। আবদুল সালামের অবস্থা বিস্তারিত লিখবে। আমি তো অজ্ঞান। আমাকে বাতিলের দলে রেখ। মাফিজজাকে দুয়া মুন্সী আবদুল লতাফকে দুয়া।

৩রা অক্টোবর, ১৮৫৪ অসদুল্লা

২৭

হায়! হায়! অত ভাল মেয়েটা বাঁচল না! নিঃসন্দেহে তোমার এবং তার শাশুড়ীর কি বিপদটা যে হ'ল! আর তার মেয়েটা তো বুঝতেই পারল না কত বড় বিপদটা তার হ'ল। ছেলেটা হয়ত খুঁজবে এবং জিজ্ঞেস করবে আম্মা কোথায় আছে? ওর ওই জিজ্ঞাসাটাই তোমাকে আরো কাঁদাবে। যাই হোক, এখন ধৈর্য্য ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। দুঃখ করো, শোক করো, কাঁদো-মাথা চাপড়াও, শেষে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকতে হবে। আল্লাহ আব্দুল লতীফকে এবং তোমাকে ও অনাথদের দাদী ও পিসিমাদের কুশলে রাখুন। এবং তোমার কৃপার আঁচল ও দয়ার কোলে ওদের রাখুন।...

জুম্মা ২৭শে অক্টোবর, ১৮৫৪ ইং

২৮

বন্ধু ও জ্ঞানী,

আমার ওপর রাগ কেন? না আমি তোমার কাছে আসতে পারছি, না তুমি আসতে পারছ। শুধু চিঠিপত্র। তাহলে তুমিই ভেবে দেখ, তুমি কতদিন থেকে তোমার ছেলেপুলেদের কুশল সংবাদ দাওনি।

শেখ ওজীরুদ্দীন ও মির্জা হসন আলী বেগ আশাকরি পৌঁছে গেছে। ওদের সম্বন্ধে জানাও। কাল থেকে রমজান শুরু হয়েছে। কাল সারাদিন গরম ছিল আর বিকেল থেকে যেন জল বরফ হয়ে যায়, এত ঠাণ্ডা! আর হাওয়ার ব্যাপার—আমি তো রাত্রে কম্বল নিয়েছিলাম। এই হাওয়াকে বিশ্বাস নেই, এখনো আমার দিন শেষ হয়নি!

হ্যাঁ সাহেব, মির্য়া তফ্‌তা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে নাকি। দু সপ্তাহ ওর কোনো চিঠি নেই। খোদা জানেন কোথায় আছেন, কি করছেন, কি কাজে ব্যস্ত আছেন। তুমি যদি ওর খবর জানো তাহলে আমাকে জানাও।

আমি নিজের ঘরের এই রীতি দেখেছি, ছেলেরা সাত আট বছরের হলেই আর যদি সে সময় রমজান শুরু হয় তাহলে তাদের দিয়ে রোজা রাখানো হয় এবং নামাজ পড়ানো হয়। রাত্রে আমার খেয়াল হ'ল, তুমি এ বছর বেগমকে পাছে রোজা করাও। এখন ওর বয়সই বা কত হ'ল? ন'দশ বছরে রোজা রাখা—সে যাইহোক, আমাকে খবরটা জানাও আর নিজের ও নিজের রোজা ও প্রতিটি রোজার খবর বিস্তারিত লেখ।

মুন্সী আব্দুল লতীফের খবর জানাও। ও কেমন আছে? বুঝেশুনে রোজা রাখুক। যেন এমন না হয় যে গরমে রোজা রেখে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আমার তরফ থেকে সবাইকে দুয়া ও হুসেন আলী খাঁ-র তরফ থেকে সবাইকে শ্রদ্ধা ও সেলাম। আর আব্দুল সলাম এবং বেগম ওদেরকেও দুয়া।

১৯শে মে, ১৮৫৫ অসদুল্লা

২৯

নাও সাহেব! তামাশা শোনো। তুমি আমাকে বোঝাচ্ছ যে তফ্‌তাকে ব্যথিত করো না। আমি তো ওর চিঠি না আসাতে ঘাবড়াচ্ছিলাম যে পাছে আমার দ্বারা ও ব্যথিত হয়। পরে যখন তোমাকে লিখলাম আর তুমি ঠিকভাবে খবর দিলে তখন ও আমাকে চিঠি লিখল।

উপরন্তু আমি সেই চিঠির উত্তর পাঠিয়েছি। সেই যে একটা চিন্তা ছিল তা তোমার কৃপায় দূর হয়ে গেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখন কোন্ ব্যাপার বাকী আছে যার জন্য তুমি ওর সুপারিশ করছ? ঈশ্বরের দিব্যি তফ্‌তাকে আমি নিজের ছেলে মনে করি। আর আমার গর্ব হয় যে, খোদা আমাকে এ রকম এক যোগ্য ছেলে দান করেছেন। ভূমিকা থাক, আমার খবরই রাখছ না তুমি। আমি নিজের হৃদয়ে দগ্ধ হচ্ছি –

"গয়া হো জব্ আপনা হি জেওড়া নিকল
কাঁহা কী রুবাঈ! কাঁহা কী গজল।"

আশাকরি সে আর তুমি আমার ত্রুটি মেনে নেবে। আর মাফ করে দেবে। খোদা আমার ওপর রোজা, নামাজ মাফ করে দিয়েছেন। তুমি বা তফ্‌তা কি এটুকু মাফ করবে না?

২রা জুন, ১৮৫৫ অসদুল্লা

নবাব আলাউদ্দৌল্লা সঅদুদ্দীন বাহাদুর 'শফক্'কে লেখা চিঠি

[ইনি কালপীর রঈস ছিলেন। গালিবের প্রিয় শিষ্য। একটি গদ্যের ও দুটি পদ্যের বই লেখেন। ১৮৮২ সালে মারা যান]

৩০

তখন বেলা ১২টা। আমি খালি গায়ে পালঙ্কে শুয়ে হুঁকো টানছিলাম। আমার লোক এসে চিঠি দিল। পড়তেই মনে হ'ল, ভাগ্যিস গায়ে লং কোট বা জামা ছিল না, থাকলে আমি ছিঁড়ে ফেলতাম, হুজুরভের কি আর যেত? লোকসান হ'ত আমার। বিস্তারিত শুনুন।

আপনার কসীদাগুলো সংশোধনের পর পাঠিয়েছি। প্রাপ্তিস্বীকার এসেছে। কয়েকটা কাটা কবিতা উল্টা ফেরত এসেছে, এগুলোর কি দোষ জিজ্ঞেস করা হয়েছে, দোষ জানানো হয়েছে দূষিত শব্দের জায়গায় নির্দোষ শব্দ দেওয়া হয়েছে। নিন সাহেব, এই কবিতাও কসীদার মধ্যে লিখে নিন। চিঠির জবাব আজ পর্যন্ত পাইনি। শাহ্ ইসরারুল হকের নামের চিঠি ওঁকে দিয়েছি। উত্তরে উনি যা জানিয়েছেন আপনাকে লেখা হয়েছে। হজরতের তরফ থেকেও ওই চিঠির উত্তর পাইনি।

"পুর হুঁ ম্যায় শিকওয়ে সে য়ূঁ, রাগ সে জ্যাইসে বজা
ইক্ জরা ছেড়িয়ে, ফির দেখিয়ে ক্যায়া হোতা হ্যায়"

ভাবছি যে দুটো চিঠিই তো বিয়ারিং গেছিল, হারিয়ে যাওয়ার কোনোরকম কল্পনা করিনি। যাকৃগে এখন আর এতদিন পর কি আর অভিযোগ করা যায়। কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ কি? চাকরী আর গোলামীর মধ্যে বেছে নেওয়ার কি আছে?

পাঁচটা দলের হামলা একের পর এক এই শহরের ওপর হয়েছে। প্রথম বিদ্রোহীদের দ্বারা শহরের মান সম্মান লুঠ হয়েছে, দ্বিতীয় দল ভূমিকম্পের তাতে জান্, মাল ইজ্জত, বাসিন্দা, আকাশ, জমি এবং মানুষের অস্তিত্ব সব লুঠ হয়েছে। তৃতীয় দল যুগের, হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। চতুর্থ হামলা কলেরার ওতে বহুলোক মারা যায়। পঞ্চম হামলা জ্বরের, তাতে সাধারণত শক্তি সামর্থ্য লুঠ হয়। এখনো পর্যন্ত এই দল শহর থেকে যায়নি। আমার ঘরে দুজন লোক জ্বরে ব্যস্ত। একটা বড়ছেলে আর একজন আমার পরিচারক। খোদা এদের দ্রুত সুস্থ করে তুলুন। বৃষ্টি এখানেও ভাল হয়েছে। কিন্তু যেমন কাল্পী এবং বেনারসে হয়েছে সে রকম নয়। জমির মালিক খুশী, চাষ তৈরী, খরিফের বিপদ কাটল। রবির জন্য পৌষ মাসে মেঘ দরকার। বই-এর পার্শেল পরশু পাঠানো হবে।

মির্জা হাতিম আলী মেহেরকে লেখা চিঠি

[গালিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন আলী মেহের।]

৩১

জনাব মির্জা সাহেব, দিল্লীর অবস্থা এই রকম—

"ঘরমেঁ থা ক্যায়া জো তেরা গম উসে গারত করতা
ওহ্ জো রখতে থে হম্ ইক হসরতে-তামীর, সো হ্যায়।"

আমার ঘরে ছিলটাই বা কি যে তোর দুঃখ তাকে বরবাদ করত? এখানে তো লেনদেনের শুরু থেকেই একটা সংসার বসানোর আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটা এখনো আছে।

এখানে আছেটাই বা কি যে লুঠ করবে? ও খবরটা নেহাতই ভুল। যদি কিছু থাকে তাহলে কিছু গোরা সেনার মর্মান্তিক স্মৃতি। লেখক এবং ফৌজের লোকেরা একসঙ্গে পরস্পরের মতামতে এমন ব্যবস্থা করে যে সে ঝামেলা মিটে গেছে, এখন শান্তি। স্বর্গত নাসির যিনি তোমার ওস্তাদ ছিলেন, আমারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও একই পথের পথিক। শুধু গজল লিখতেন। কসীদা বা মসনবীতে ওঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। সুভান আল্লাহ্। তুমি কসীদাতে এমন রঙ দেখিয়েছ যে ইন্‌শাঁর ঈর্ষা হবে। মসনবী দেখে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি কি বলব!

সাহেব আমার, ওকালতিতে নিযুক্তির জন্য অভিনন্দন, মক্কেলদের কাছ থেকে কাজ নাও। পরীদের বশীকরণ করো, মসনবী পৌচেছে। মিথ্যা বলা আমার স্বভাব নয়। বোলচাল তো আচ্ছা দিয়েছ। ভঙ্গিও ভাল। ব্যাখ্যাও ভাল। চিরপ্রচলিত প্রথা একদম সাফ। কালো মানুষদের বিচার কি আর চাইব, বাহ্! কি মজাটাই না দিচ্ছে! এই মসনবীটা আগের মসনবীটাকে নিরর্থক করে তুলেছে। বখশিশের কথা এই অপরাধীর কাছে কবে নাগাদ পৌঁছাবে? কিন্তু এদিক দিয়ে বখশিশের মালিক পাপী।

বখশিশের আশায় আছি। আমি এখনো পর্যন্ত এটাও বুঝিনি যে এটা কবিতা না গদ্য? আর এর বিষয়টা কি? মির্জা ইউসুফ আলী খাঁ আট দশ মাস ধরে স্ত্রী ছেলেপুলেসহ এই শহরে অবস্থান করছে। এক হিন্দু ধনীর ঘরে পাঠশালার মতো করেছে আমার ঘরের পাশে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। ওখানেই আছে। যদি ওকে চিঠি দাও তাহলে আমার বাড়ীর ঠিকানা লিখে দিও। আর এটা জেনে রাখ যে, আমার চিঠির ঠিকানায় মোহল্লার নাম লেখার দরকার নেই। শহরের নাম, আমার নাম, ব্যস্। হ্যাঁ, বন্ধু-বান্ধবদের চিঠিতে আমার বাড়ীর কাছের ঠিকানা থাকাটা জরুরী। দুদিন থেকে মেহরের চটক দেখছি। প্রায় তোমার কথা হয়, আজকাল তো উনি সবসময় এখানে আসেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় বসে বলেন, এইমাত্র এখান থেকে উঠে গেছেন। তোমাকে সেলাম জানিয়েছেন।

৩২

মির্জা সাহেব,

আমার এসব কথা পছন্দ নয়। এখন আমার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। পঞ্চাশ বছর রঙ এবং গন্ধের পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। যৌবনের প্রারম্ভে এক সফল পথপ্রদর্শক পীর উপদেশ দিয়েছিলেন, সংযম ও তপস্যা আমার নামঞ্জুর। আমি পাপ মানি না। খাও পিয়ো মজা করো। কিন্তু মনে থাকে যেন মিছরীর মাছি হয়ে যাও, মধুর মাছি হয়ো না। সুতরাং এই উপদেশই আ ম মেনে চলছি। কারো মৃত্যুর জন্য সেই-ই দুঃখ করে যে নিজে মরবে না। কিসের অশ্রুপাত! শোক-বিলাপ কিসের! স্বাধীনতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো। দুঃখ করো না। যদি নিজের বন্দীত্বে এতোই খুশী হও তাহলে

চুয়াজান না হোক মুয়াজান-ই ভাল। যখন আমি স্বর্গের কল্পনা করি এবং মুক্তির একটা প্রাসাদ, একটা অপ্সরার আকাঙ্ক্ষা, অমরত্বের জন্য বেঁচে থাকা ভাল লাগে না। এই এক সৌভাগ্যবতীর সঙ্গে জীবন যাপন। কল্পনা করলেই মন ঘাবড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডটাই উগলে আসে। হায়! হায়! ওই অপ্সরী রমণী অসহ্য হয়ে যাবে, মন ঘাবড়াবে না কেন? সেই মূল্যবান পাথরের প্রাসাদ আর সেই 'তুবা'র একটা ডাল! নিপাত যাক, নিপাত যাক সেই কু-দৃষ্টি, সেই অপ্সরী। ভাই হুঁশে এস, আর অন্য কোথাও হৃদয় দাও।

৩৩

মির্জা সাহেব,

আমি যে চিঠির ভঙ্গি সৃষ্টি করেছি যেন ওটা মুখের কথা। হাজার ক্রোশ দূর থেকে কলমের মুখ দিয়ে কথা বলা, বিরহে মিলনের মজা উপভোগ করো, তা তুমি কি আমার সঙ্গে কথা না বলার কসম খেয়েছ? বিস্তারিত না হোক এটুকু তো বলো কি কথা তোমার মনে উদয় হ'ল? দীর্ঘদিন হয়ে গেল, না তোমার চিঠি এসেছে, না কুশল সংবাদ জানিয়েছ বা বই-এর বিবরণ পাঠিয়েছ। হ্যাঁ, মির্জা তফ্তা হাথরস থেকে এই খবর দিয়েছে যে পাঁচটা বই-এর পাঁচটা পাতার শুরু ওকে দিয়ে এসেছে আর উনি কালো ফলক তৈরী করেছেন। এ তো অনেকদিনের কথা যা তুমি আমাকে জানিয়েছ যে, দুটো বই-এর সোনালী কভার প্রস্তুত করা হয়ে গেছে তারপর ওই দু'টো বইয়ের কভারের খবর কি? আর এই পাঁচটা বই-এর প্রস্তুতিতে দেরী কত? ছাপাখানার মালিকের পরশু চিঠি এসেছে। সে লিখেছে যে

তুবা—স্বর্গের এক গাছ, যার ফল অত্যন্ত সুস্বাদু।

তোমার চল্লিশটা বই-এর মজুরী নেওয়ার পর সাতটা কপি এই হপ্তায় তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এখন হুজরত অপেক্ষা করুন এই সাতটা কপি কবে আসবে? যদিও কারিগরদের আলসেমীতে তুমিও নিরুপায়। কিন্তু এমন কিছু লেখ যে, চোখের দেখা এবং মনের চিন্তা দূর হয়। খোদা করুন ওই তেত্রিশ কপির সঙ্গে কিম্বা দু-তিন দিন আগে পিছে এই সাতটা কপি তোমার কাছে আসে। সাধারণ লোকেদের একসঙ্গে পাঠানো যায়।

আমার কবিতা আমার কাছে কখনো কিছু থাকেনি। নবাব জিয়াউদ্দীন খাঁ এবং হুসেন মির্জা সংগ্রহ করতেন। যা আমি বলেছি ওঁরা লিখে নিয়েছেন। ওঁদের দু'জনের ঘর লুট হয়েছে। হাজার হাজার টাকার লাইব্রেরী নষ্ট হয়েছে। এখন আমি নিজের কবিতা দেখার জন্য ছটফট করি। কয়েকদিন আগে একজন ফকীর, গলার স্বর বেশ ভাল, গায়কও, আমার একটা গজল কোথ্ থেকে লিখিয়ে এনে আমাকে দেখাল। বিশ্বাস করো আমার কান্না এসে গেছিল। গজলটা লিখে পাঠাচ্ছি আর তার পরিবর্তে এই চিঠির উত্তর চাচ্ছি।

"দর্দ মিন্নত কশ্-এ-দওয়া ন হুয়া
ম্যায় ন আচ্ছা হুয়া, বুরা ন হুয়া।
জমা করতে হো কিঁউ রকীবোঁ কো
ইক্ তামাশা হুয়া গিলা ন হুয়া,
রহজনা হ্যায় কি দিল সতানী হ্যায়
লে কে দিল্, দিলস্তাঁ রওনা হুয়া।
হ্যায় খবর গর্ম উন্‌কে আনেকী
আজ হী ঘর মেঁ বোরিয়া ন হুয়া,
জখম্ গর দব গয়া লহু ন হুয়া,
কিতনে শীরিঁ হ্যায় তেরে লব্ কি রকীব
গালিয়াঁ খাকে বেমজা ন হুয়া
ক্যায়া ওহ্ নমরূদ কী খুদাঈ থী

বন্দগী মেঁ মেরা ভলা না হুয়া
জান্ দী। দী হুয়ী উসী কা থী
হক্ তো য়হ্ হ্যায় কি হক্ অদা ন হুয়া
কুছ্ তো পড়িয়ে কি লোগ্ কহতে হ্যায়
আজ গালিব গজল সরা না হুয়া।"

মুন্সী শিউ নারায়ণ 'আরাম'কে লেখা চিঠি

[মুন্সী শিউ নারায়ণ আগ্রার অধিবাসী ছিলেন। জাতিতে মাথুর। সেই যুগে তিনি ছিলেন ইংরাজীর শিক্ষক। পরে আগ্রার নগর নিগম সচিব হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। গালিবের দুটো বই 'দস্তম্বো' ও 'দীওয়ান-এ-উর্দু' এখান থেকেই ছাপা হয়। ১৮৫৭ সালে মারা যান।]

৩৪

বৎস,

চোখের মণি শিউনারায়ণ জানুক যে, আমি কি ছাই তাকে জানতাম? যখন জানলাম যে, সে নাজীর বংশীধরের নাতি তখন বুঝতে পারলাম, সে আমার সাতরাজার ধন। এখন যদি তোমাকে মান্যবরেষু অথবা কৃপানিধান লিখি তাহলে আমি অপরাধী হব। আমাদের পরিবার এবং তোমাদের পরিবারের মধ্যে মেলামেশার কথা তুমি কিভাবে জানবে বলো? আমার কাছে শোনো। তোমার ঠাকুরদার বাবা, অহদনজফ খাঁ ও হমদানী, আমার নানা খর্গত গুলাম হুসেন খাঁ'র মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। যখন আমার নানা চাকরী ছেড়ে এসে ঘরে বসলেন, তোমার ঠাকুরদাও তারপর

কোথাও চাকরী করেননি। এসব কথা আমার জ্ঞান হওয়ার আগে। কিন্তু আমি বড় হওয়ার পর দেখি মুন্সী বংশীধর খাঁ সাহেবের সঙ্গে রয়েছেন এবং তিনি যে সরকারের কাছে কাঁঠম গাঁও-এ নিজের জায়গীরের দাবী করেন যে ব্যাপারে মুন্সী বংশীধরকে সাহায্য করতে এবং ওকালতি করতে দেখি। আমি এবং উনি সমবয়সী। হয়ত মুন্সী বংশীধর আমার থেকে দু এক বছরের বড় কি ছোট হবেন। তখন উনিশ কুড়ি বছর, আমার আর ওঁর বয়সও ওই রকমই হবে। দাবা খেলতে খেলতে গল্প করতে করতে অর্দ্ধেক রাত কাবার হয়ে যেত। যেহেতু ওঁর ঘর খুব একটা দূরে ছিল না, এইজন্য যখন ইচ্ছা চলে আসতেন। আমাদের এবং ওঁর বাড়ীর মাঝে পড়ত মছিয়া রণ্ডীর ঘর এবং আমাদের আরো দুটো ঘর। আমাদের বড় বাড়ী যেটা এখন লছমী চন্দ্ শেঠ কিনে নিয়েছে। এই বাড়ীর বাইরের দিকে ছিল আমার বৈঠকখানা পাশে এক 'খটিয়াবালী হাভেলী'। সলীম শাহ'র বাড়ীর পাশে দ্বিতীয় বাড়ী আর 'কালে মহলে'র সঙ্গে লাগালাগি একটা, আর একটা ঘর যেটাকে 'কশ্মীরণ ওয়লা' বলা হ'ত। ওই ঘরের ছাদে আমি ঘুড়ি উড়াতাম এবং রাজা বলবান সিং-এর সঙ্গে ঘুড়ির প্যাঁচ লড়তাম। ওয়াসিল খাঁ নামে এক সিপাহী তোমার ঠাকুরদার পাশের ঘরে থাকত। সে ওইসব ঘরের ভাড়া তুলে ওঁর কাছে জমা দিত।

ভাই, তোমার ঠাকুরদা বহুকিছু রেখে গেছেন। জায়গা কিনেছিলেন। নিজের জমিদারী করেছিলেন। দশবারো হাজার টাকা সরকারকে রেভিনিউ দিতেন। এখন সেসব তোমার হাতে এসেছে কিনা আমাকে বিস্তারিত জানাবে তো?

১৯শে অক্টোবর, ১৮৫৮

বৎস মুন্সী শিউনারায়ণকে দুয়া জানানোর পর বলছি,

ছবি পৌঁচেছে, চিঠি পৌঁচেছে। শোনো আমার বয়স সত্তর বছর এবং তোমার ঠাকুরদা আমার সমবয়সী এবং সমসাময়িক ছিলেন। আর আমি আমার নানাসাহেব স্বর্গত খাজা গুলাম হুসেনের কাছে শুনেছি যে, তোমার প্রপিতামহ ওঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁকে বলতে শুনেছি যে আমি বংশীধরকে নিজের সন্তান মনে করি। সুতরাং এই কথা থেকে প্রমাণ হয় শতবর্ষের পরিচয় আমাদের। তারপর আমাদের পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রের রেওয়াজ বন্ধ। আর এই রেওয়াজ না থাকার ফলে এটুকুই প্রাপ্তিস্বীকার করা যায় যে, আমরা দু'জনেই বিচ্ছিন্ন। যদি আমার অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে কখনোই আকবরাবাদে ডেকে পাঠাতে না। কিছুদিন হ'ল ডান হাতে একটা ফুস্কুড়ি হয়, ফুস্কুড়ি বড় হয়ে ফোঁড়া হয়। ফোঁড়া পাকে ও ফাটে। তারপর হয় একটা ক্ষত, শুধু কি ক্ষত, গর্ত হয়ে যায়। হিন্দুস্থানী চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করাই, অবনতি হতে থাকে, দু'মাস থেকে কালে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছি। সূঁচ ফোটাচ্ছে, ছুরি দিয়ে মাংস কাটা হয়েছে, দিন কুড়ির মধ্যে ভাল হয়ে যাব।

আর একটা গল্প শোনো, গদরের জমানা শেষ হয়ে দিল্লী দখলের পর পেন্সন চালু হয়। বাকী প্রতিটি পাই পয়সা পেলাম। অন্যান্যদেরও নিয়মানুসারে কম বেশী চালু হয়েছে। কিন্তু লর্ড সাহেবের দরবার এবং রাজবস্ত্র যা সাধারণভাবে স্থির ছিল বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি সেক্রেটারী সাহেবও আমার সঙ্গে দেখা করেননি। বলে পাঠিয়েছেন যে, তোমার সঙ্গে এখন দেখা করা সরকারের ইচ্ছে নয়। আমি ফকীর, আশা করেছিলাম। এখন নিরাশ হয়ে ঘরে বসে থাকি। শহরের শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করাও ছেড়ে দিয়েছি। বড়লাট সাহেবের আগমনের সময় পাঞ্জাবের গভর্ণর বাহাদুর দিল্লী আসেন এবং দরবার করেন। যাক্‌গে, এসবে আমার কি? হঠাৎ দরবারের তৃতীয় দিনে বারোটার সময়ে চাপরাশি এসে গভর্ণরের

সমন দেয়। ভাই, এটা ফেব্রুয়ারীর শেষ, আর আমার অবস্থা এই যে, ওই ডান হাতের ক্ষত ছাড়াও তালুতে এবং বাঁ হাতে একটা ফোঁড়া আলাদাভাবে হয়েছে। প্রয়োজনে প্রস্রাব করতে হয়। বড় কঠিন। যাই হোক গাড়ী চেপে গেলাম। প্রথমে সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর গভর্ণর সাহেবের খিদমতে হাজির হলাম। কল্পনা তো দূরের কথা, আকাঙ্ক্ষাতেও যা ছিল না তাই পেলাম অর্থাৎ কৃপা, ভাল ব্যবহার পর্যন্তও। আসার সময় রাজবস্ত্র দিলেন এবং বললেন যে, তিনি নিজের তরফ থেকে ভালবাসার দান দিলেন। আরো জানালেন, লাট সাহেবের দরবারেও আমাকে ডাকা হবে, রাজবস্ত্রও দেওয়া হবে আম্বালা, যাও, দরবারে অংশ নাও, রাজবস্ত্র পরো। আমার অবস্থাটা জানালাম। বললেন যাইহোক পরে কখনো দরবারে অংশ নিও। ফোঁড়ার নিকুচি করেছি, আম্বালা যেতে পারিনি। আগ্রা কি ভাবে যাব?

বাবু হরগোবিন্দ সহায়কে সেলাম।

৫রা মে, ১৮৬৩

৩৬

বাবু হরগোবিন্দ সহায় নশাতকে লেখা চিঠি

[পিতার নাম খুবলাল। এক সময় দিল্লীর সদর আমীন ছিলেন। পরে গোয়ালিয়র চলে যান এবং ওখানে মীর মুন্সী'র পদ লাভ করেন। কোটা রাজ্যের বিচারপতি হন। ১৮৯১ সালে মারা যান। উর্দু ও ফারসী দুটো ভাষাতেই কবিতা লিখতেন।]

সাহেব, তোমাকে ধন্যবাদ। শরাবের দামের দুটো চিঠি পাঠিয়েছ। ভাই, কাসটেলন এবং ওভালটম দুটোই আমি চব্বিশটাকা ডজন বরাবর নিয়েছি।

এখন এখানে দাম বেড়ে গেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, যদি ওখানেও এই দাম হয় তাহলে আর আমার ভাগ্যে নেই। আমি ভেবেছিলাম ওখানে দাম কম। যাকগে কি আর করা যায়। রুটি জুটলেই যথেষ্ট। সারা মাসের রুটির দাম এক ডজনের মূল্য।

৩৭

নবাব অমীনুদ্দীন আহমদ খাঁ রঈস লোহারুকে লেখা চিঠি

[নবাব আহমদ বখ্‌শ খাঁ'র পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর লোহারুর সিংহাসনে বসেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে গালিবের শ্যালক ছিলেন।]

ভাই সাহেব, আজ পর্যন্ত ভেবেছি যে, শ্রদ্ধেয়া বেগম সাহেবার মৃত্যুর ব্যাপারে তোমাকে কি লিখি! শোক প্রকাশের ব্যাপারে তিনটে রীতি আছে —শোকের ব্যাখ্যা করা, ধৈর্য্যের শিক্ষা, মোক্ষলাভের প্রার্থনা। সুতরাং, ভাই, শোকের ব্যাখ্যা তোমার কাছে নেহাতই বাতুলতা। কেন না, যে দুঃখ তোমার হয়েছে সেটা অন্য কারো হতে পারে না, সম্ভব নয়। ধৈর্য্যের শিক্ষা একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার। এটা এমন একটা ঘটনা যে, স্বর্গত নবাবের মৃত্যুর দুঃখও তাজা করেছে। এই ঘটনার পর ধৈর্য্যের কথা কি আর বলা যায়! আর থাকল মোক্ষলাভের প্রার্থনা। আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার দুয়া। কিন্তু যেহেতু উনি আমার উপকারী এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল প্রবল, তাই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ওঁর জন্য দুয়া বের হচ্ছে।

যাই হোক এখানে তোমার আসার কথা শোনা যাচ্ছিল। সেজন্য চিঠি লিখিনি। এখন জানতে পারলাম শরীর খারাপের জন্য আসা হবে না। এই কারণে কয়েক লাইন লিখলাম, খোদাতাল্লা তোমাকে কুশলে এবং সুস্থ রাখুন।

তোমার প্রসন্নতা কামনা ক'রে

১৯শে নভেম্বর, ১৮৬৬ গালিব

৩৮

জুল্‌ফকারউদ্দীন হৈদর খাঁ ওরফে হুসেন মির্জাকে লেখা চিঠি

[জুলফ্‌কারউদ্দীন হৈদর নাজির হুসেন মির্জা নামে বিখ্যাত ছিলেন। গালিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাহাদুর শাহের কাছ থেকে নজারত্‌ খাঁ বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৮৯ সালে মারা যান।]

নবাব সাহেব,

পরশু সকালে তোমার চিঠি পৌঁচেছে। তারপর বেলা হতে লাট সাহেবের সৈন্যরা এসে কাব্‌লী দরওয়াজার দেওয়ালের কাছে ভোলুশাহের কবরের সামনে তাঁবু ফেলল আর বাকী সৈন্য 'ত্রিশহাজারী বাগ' পর্যন্ত নেমে গেল। শুক্রবার ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৫৯, এখন গালিবের বিপদের কথা শোনো। পরশু তোমার চিঠি পড়ার পর ক্যাম্পে গেলাম। কেরানীর সঙ্গে দেখা করলাম। ওঁর তাঁবুতে বসে সেক্রেটারী বাহাদুর সাহেবের কাছে খবর পাঠালাম। চাপরাশীর সঙ্গে কল্লুও গিয়েছিল। জবাব এল সেলাম জানানোর আর বলার যে অবসর নেই। যাইহোক আমি ঘরে

ফিরে এলাম। কাল আবার গেলাম, খবর পাঠালাম। হুকুম এল যে, গদরের জমানায় তুমি বিদ্রোহীদের খোশামোদী করতে। এখন আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাও? চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম। এই সংবাদটা চির অন্ধকারের, নৈরাশ্যের : না দরবার, না রাজবস্ত্র, না পেন্সন...

বাকী খবর এই যে ভরতপুরের রাজা বারাত নিয়ে পাতিয়ালা গেছিলেন, এই কারণে আগ্রায় লর্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন নি। এক সপ্তাহ পর এখানে ফিরে এসেছেন। আজ ওঁর সাক্ষাতের দিন। শনিবার ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৫৯ এগারোটার সময় আমি চিঠি লিখছি। তোপধ্বনি করা হচ্ছে। বোধ হয় রাজা সাহেব এই সময় সাক্ষাত করলেন। কাল রবিবার, পরশু সোমবার বা মঙ্গলবার লাটসাহেব চলে যাবেন। শোনা যাচ্ছে পেশোয়ার পর্যন্ত যাবেন কাল সকালে মুহম্মদ কুলী খাঁ আসেন। হাতে একটা ইংরাজী আবেদনপত্র। বলতে লাগলেন, "মাহুত তালিব আলী আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে যে, এটা পেশ করার সময় নেই। আমি এই ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম তোমার নৈরাশ্যের কথা শুনে গেলাম। আমার আকাঙ্ক্ষার কথা যা লেখা আছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

ইব্রাহিম খাঁ আলওরে জলপিপাসার রোগে মারা গেছেন। খোদা ওকে শান্তি দিন আর আমাকে এই সৌভাগ্য প্রদান করুন। কমিশনার সাহেবের কোনো নায়েব এখানে আসেনি,না কোনো ইংরেজের কাছ থেকে এর সত্যতা প্রমাণ হতে পারে। এটুকু শোনা যাচ্ছে যে, লাহোরের জনসাধারণের ক্ষতি-পূরণের জন্য একটা ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে। আর এই আদেশ হয়েছে যে, জনসাধারণের যা মাল কালোরা লুঠ করেছে তাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণের হিসাব সরকার করবেন অর্থাৎ হাজারটাকা যে চাইবে তাকে একশোটাকা দেওয়া হবে আর যারা গোরাদের সময় লুণ্ঠিত হয়েছে এর ক্ষতিপূরণ হবে না।

বাড়ীগুলোকে হামিদ আলি খাঁ'র বাড়ী, হামিদ আলি খাঁ'র বাড়ী ক'রে কেন লিখছ? ওগুলো তো বহুদিন হ'ল দখল হয়ে সরকারের সম্পত্তি হয়ে গেছে। বাগানের চেহারা পাল্টে গেছে। অন্তঃপুর ও কুঠিতে গোরারা থাকে। এখন ফাটক এবং আশপাশের দোকানগুলো ভেঙ্গে দেওয়া

হয়েছে। ইঁট পাথর নীলাম করে টাকা সরকারী খাজনাতে জমা হয়েছে। কিন্তু এ ভেব না যে, হামিদ আলি খাঁ'র বাড়ীর সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেছে। সরকার নিজের দখলের একটা বাড়ী ভেঙ্গে দিয়েছে। যেখানে অওধের বাদশাহের সম্পত্তির ওই হাল সেখানে জনসাধারণের সম্পত্তির কথা কে আর জিজ্ঞেস করছে বলো? তুমি এখনো বোঝোনি আর বুঝবেও না যে সরকার কি বুঝছে! কি অপমানজনক! কি বাজে আদেশ! কি রকম বিচার! যে আদেশ দিল্লীতে হয়েছে তা যেন ঈশ্বরের হুকুম এর কোনো বিচার নেই, এখন এমনি ধরে নাও যে, না আমি কখনো কোনো জায়গার রঈস ছিলাম, না সমাজে উচ্চপদ বা মর্যাদা ছিল, সম্পত্তি ছিল, না পেন্সন পেতাম। জীবদ্দশায় রামপুর আমার ঘর এবং মৃত্যুর পর দফনে স্থান। যখন তুমি লেখ যে, ঈশ্বরের দোহাই তুমি ওখানে যাও তখন আমার হাসি পায়। আশা করছি রজবের চাঁদ আমি রামপুরেই দেখব, যে তদবীর তুমি দস্তাবেজের ব্যাপারে করেছ সেটা খুবই উচিত হয়েছে। পেশ করার ব্যাপারে ও বিলাত পৌঁছানর ব্যাপারেও। সজ্জাদ মির্জা ও আকবর মির্জা নিজের বৃদ্ধ বয়সে এর ওপর দখল পাবে, ইউসুফ মির্জা খাঁকে তুয়া, কসীদা ও মখমলের হাল জানলাম। শ্রদ্ধেয় সেই ব্যবহার করছেন যা একজন বাবা ছেলের সঙ্গে করে, একজন প্রভু তার গোলামের সঙ্গে করে। ওঁর ইচ্ছা যে তুয়ার বখশিশ আলাদা এবং ওস্তাদির বখশিশ আলাদা পাই।

কিন্তু মেরিজান্, বিচার করো, এই বখশিশে তো জীবন কাটে না। এটা চিন্তা করাও অভদ্রতা, আমার জীবন কতদিন আর। এই সাত মাস, আর পরের বারোমাস। এই মাসে আমি আমার প্রভুর কাছে চলে যাব। ওখানে না রুটির চিন্তা, না জলের তৃষ্ণা, না শীতের তীক্ষ্ণতা, না গরমের তীব্রতা, না হাকিমের ওপর ক্ষোভ, না গুপ্তচরদের বিপদ, না বাড়ীর ভাড়া দিতে হয়, না কাপড় কিনতে হয়। না মাংস, ঘি চেয়ে পাঠানো, না রুটি বানানো, স্রেফ আরাম আর আরাম।

মৃত্যুকাঙ্ক্ষী

৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৯ গালিব

৩১

নবাব ইউসুফআলী খাঁকে লেখা চিঠি

[ইনি গালিবের শিষ্য ছিলেন এবং রামপুরের নবাব। ১৮১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৫ সালে পিতার মৃত্যুর পর রামপুরের সিংহাসনে বসেন। ১৮৬৫তে মারা যান। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ইনি গালিবকে বরাবর ১০০ টাকা করে ভাতা দিতেন। এবং গালিবকে নিজের ওস্তাদের মতো সম্মান করতেন।]

কৃপানিধান,

প্রণামান্তে নিবেদন, মোরাদাবাদে পৌঁছান আর পালকি নেমে আসার পর পুল ভেঙ্গে যাওয়া, আসবাবপত্রের গাড়ী এমন কি শোবার জিনিসপত্র সহ লোকদের ওই কড়া শীতে মাঠে পড়ে থাকা, শীত ছাড়া আর কিছু না খাওয়া। যাই হোক, ওদের ওপর যা হচ্ছে ওরাই জানে, আমি মোরাদাবাদের একটা ছোট্ট বাড়ীতে উঠি, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, কম্বল ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকি, নিজের এই শেরটা পড়ে পড়ে রাত কাটাই—

গর্ম-এ-ফরয়াদ রকৃথা শক্ল-এ-নিহালী নে মুঝে
তব্ অমাঁ হিজ্র-মেঁ দী বর্দ-এ-লিআলী নে মুঝে।"

সকালে জীর্ণ দুঃখে মুষড়ে উঠলাম। সাহেবজাদা মুমতাজ আলি খাঁ বাহাদুরের পাঠানো দু'জন দূত এল, সঈদুদ্দীন খাঁ সাহেবের ওখানে নিয়ে গেল। সাহেবজাদা যেরকম সম্মান আদর করলেন এবং সঈদুদ্দীন খাঁও সেরকম সম্মান আদর করলেন যা আমার আশাতীতেরও বেশী। হঠাৎ প্রধান বিচারপতি মৌলবী হসন খাঁ বাহাদুর এলেন এবং আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। পাঁচদিন ওখানে থাকলাম। ভাই, নবাব মুস্তাফা খাঁ বাহাদুর ওখানেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। পরের

দিন উনি রামপুর আর আমি, এই অধম অত্যাচারপীড়িত ও দুঃখভরা দিল্লীএসে হাজির হলাম। ৮ই জানুয়ারী ১৮৬৬ ঘরে পৌঁছালাম। হুজুরের সাহায্য না থাকলে কি আমি বেঁচে দিল্লী পৌঁছাতাম।

গালিব

৪০

কৃপানিধান,

শ্রদ্ধান্তে নিবেদন, আপনার চিঠির দর্শনই আমাকে আমার জীবনের ওপর বিশ্বাস প্রদান করেছে। এই সফরের বিস্তারিত কি আর লিখি? দিল্লী থেকে রামপুর পর্যন্ত পদচুম্বনের অভিলাষে যৌবনকালে গেছি। আবহাওয়ার বিরোধীতা ও পরিস্থিতির পার্থক্যকে কখনো মানিনি আর রাস্তাকে কদাপি চিন্তার মধ্যে আনিনি। ফেরার সময়, বিরহের দুঃখ সেইভাবেই নিঙড়ে দিয়েছে। আত্মার মূলবস্তু দ্রবীভূত হয়ে প্রত্যেক লোমকূপ থেকে ঝরে পড়েছে। যদি আপনি সাহায্য না করতেন তাহলে দিল্লী পর্যন্ত বেঁচে পৌঁছান আমার পক্ষে কঠিন ছিল। শীত, মেঘ, টানাপোড়েন, খিদে মিটে যাওয়া, একাদিক্রমে অনাহার, অপরিচিত গন্তব্যস্থল, হাপুড় পর্যন্ত সূর্য না ওঠা, দিনরাত্রি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বিরাজ করা, পরে হাপুড় থেকে রওনা হওয়ার পর খাবারের মুখ দেখা গেল। রোদ খেতে খেতে দিল্লী পৌঁছালাম। এক-সপ্তাহ খেঁতলানো দুঃখে মুষড়ে পড়ে আছি। এখন সেই রকম বৃদ্ধ ও দুর্বল যতটা এই সফরের আগে ছিলাম, খোদা সেই দিন করুন যেন আবার সেই স্থানে পৌঁছাই।

"তুম সলামত্ রহো হাজার বরষ
হর্ বরষকে হোঁ দিন পঁচাশ হাজার।

স্নেহাইকামী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৬ গালিব

৪১

মীর মেহেদী মজরুহকে লেখা চিঠি

[মীর মেহেদী হুসেন মজরুহ্'র বাবার নাম মীর হুসেন ফিগার। দিল্লীর অধিবাসী। ১৮৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের সময় পাণিপথে চলে গিয়েছিলেন। পরে দিল্লী ফিরে আসেন। অল্‌বরের মহরাজার কৃপায় প্রথমে নায়েব তহশীলদার পরে তহশীলদার হ'ন। মহারাজা মারা গেলে কিছুদিন জয়পুরে থাকেন। পরে রামপুরের নবাব কাছে ডেকে নেন। ১৯০৩ সালে মারা যান। গালিবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন।]

মিয়াঁ,

আজ সোমবার। সাতই ফেব্রুয়ারী। বোধহয় জমাদী উলসানীর বাইশ। দুপুর বেলা। উস্তাদ হামিদের গলিব শেখ মুশর্‌রফ আলী আমার কাছে এল। তোমার লেখা চিঠি যেটা তুমি ১৭ জমাদীউলসানী লিখেছ আমাকে দিল। তোমার ডাকের চিঠি আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কিন্তু আমি তো শহরের বাইরে যাইনি। যেখানে থাকতাম সেখানেই আছি। খোদা জানেন চিঠি কেন এল না! আরে! এ কখনো হয় নাকি যে তোমার চিঠি পেয়েও অস্বীকার করব? তুমি নিজেই লিখেছ যে, খামের ওপর লেখা ছিল যার নামে চিঠি সে এখানে নেই। এটা কি রকম হ'ল? আমি বর্তমান—আর লিখব এখানে আমি নেই। এটা কি রকম বোকামী হে? আগ্রা, অলওয়র, কোল থেকে চিঠিপত্র বরাবরই আসছে।

তোমার বাবার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। খোদা তোমাকে ধৈর্য্য ধরার শক্তি এবং পতিব্রতাকে সান্ত্বনা দিন। আমার ভাই মির্জা ইউসুফ খাঁ দীবানাও মারা গেছে। কোথায় বা পেন্সন, কোথায় বা সাক্ষাত! এখানে জান্ সস্তা হয়ে গেছে ভাই!

"হ্যায় মৌজ্জন ইক কুলজম খুঁ কাশ য়হী হো
অভী হ্যায় অভী দেখিয়ে ক্যায়া মেরে আগে।"

ওর বিরহে আমার বুকের ভেতরে রক্তের সমুদ্রটা উত্তাল। এখন কাঁদলেই রক্তাশ্রু ঝরবে। সমুদ্র উত্তাল হলেই তো উপচে পড়ে। যদি এই রক্তাশ্রুপাত ঘটিয়েই আমার দুঃখ কমত তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু কে বলতে পারে যে ওর বিচ্ছেদের জন্য রক্তাশ্রুপাত ছাড়াও আরো কত রকমের কঠোর শাস্তি আমার ওপর নেমে আসবে না।

বুঝলে হে, যদি বেঁচে থাকি এবং যদি এক সঙ্গে আবার বসি তখন সবিস্তারে বলবো। তুমি লিখেছ আসতে চাও। যদি আসবে এস তবে বিনা অনুমতিতে এস না। মীর আহম্মদ আলী সাহেবের জন্য লিখেছ উনি এখানে আছেন কিনা? আমার জানা নেই কোথায় আছেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হ'ত। আমি তো লুকিয়ে থাকি না ভাই। লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই। সবাই জানে এখানে আছি কিন্তু না জিজ্ঞেসাবাদ না ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসেছি, না নিজের তরফ থেকে দেখে করার ইচ্ছা হয়েছে······দেখ শেষে কি হয়?

গদ্য কি লিখব, নাই বা কি বলি? সেই যাকে তুমি দেখে গেছ, শহরে এসে গেছে। দু'তিন দিন আমার কাছেও এসেছে। গত পাঁচসাত দিন থেকে আসেনি। বলছিল, বিবি এবং ছেলেদের বহরমপুরে মীর ওয়াজির আলীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে এখানে লুঠের বই সব কিনে বেড়াচ্ছে।

মীর সাহেবের কুশল সমাচার জানলাম। কিন্তু জানতে পারলাম না উনি একা আছেন না পরিবারসহ? যদি একা থাকেন, তাহলে পরিবার কোথায়?

আমি তোমার ছোট ভাইকে জানি, ও এখানে আছে এবং বেশ ভালভাবেই আছে। বড় ভাই-এর কথা লেখনি কেন? যদিও ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব গভীর নয়। কিন্তু তোমরা দু'জনেই আমার কাছে সমান প্রিয়। চিঠি দিতে দেরী করো না। নির্দ্বিধায় ডাকে দিও। বেশ বড় চিঠি।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮ গালিব।

৪২

কি বন্ধু, কি বলছ ? আমি কাজের মানুষ, না একদম কাজের বাইরে ? কল্লুকে দিয়ে মৌলবী মজহর আলীকে বলে পাঠিয়েছিলাম, 'আপনি কোথাও যাবেন না। আমি আসছি।' বুদ্ধির বহরটা দেখেছ ? উনি কি আমার বাবার চাকর যে আমি ডেকে পাঠাব ? উনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি কষ্ট করবেন না আমিই হাজির হচ্ছি। ঘণ্টা দুই পর এলেন। এদিক ওদিকের কথা হ'ল। ইংরেজী কাগজপত্র দেখালেন। ফারসীতে লেখা কাগজপত্র পড়ে দিতে হ'ল।

ওহে হজরত্, তুমি মীরণ সাহেবকে ডাকো না ? আজ্ঞে আমি তো ওকে লিখেছি তুমি চলে এস এবং একটা ঠিকানা লিখে দিয়েছি যে ওখান থেকে আমাকে খবর পাঠাতে। আমি ওকে শহরে ডেকে নেব হুজুর। সে নিশ্চয়ই আসবে।

অবশেষে ওঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এখন তোমাকে লিখছি যে, ওঁকে সংক্ষেপে বলে দাও ভাই। যদি এটা বলি তো বাড়িয়ে বলা হবে রুটি ওখানে এবং জল এখানে খাও। মোট কথা বলছি—ঈদ্ ওখানে করো আর বাসী ঈদ্ এখানে।

এবার আমার কথা শোনো, বিনা অন্নে বেঁচে থাকার কায়দা আমি জেনে গেছি। এদিক থেকে নিশ্চিত থেক। রমজানের মাস রোজা খেয়ে খেয়ে কাটল। এরপর খোদা অন্নদাতা আছেন। কিছু যদি খেতে না পাই, তাহলে দুঃখ তো আছেই। ব্যস্ সাহেব, একটা জিনিস তো খাবার আছে, দুঃখ তো দুঃখই। এটা খেয়েই না হয় কাটাব।

মীর সরফরাজ হুসেনকে আমার হয়ে আলিঙ্গন দিও, একটু আদর করো। মীর নসীরুদ্দিনকে দোয়া এবং শফী আহম্মদ সাহেবকে ও মীর আহম্মদ আলীকে আমার সেলাম জানাবে। মীরণ সাহেবকে না সেলাম না দোয়া, চিঠিটা পড়িয়ে এদিকের জন্য রওনা করিয়ে দিও।

আহা···হা, একটা কথা মনে পড়েছে, উনি শহরের বাইরেই বা থাকবেন কেন? আর কারো ডাকার অপেক্ষাই বা কেন থাকবেন? চৌপায়া, পালকী, দোলা যাতেই আসুন বল্লীমারোর মোহল্লায় নামতে বলো। মির্জা কুর্বান বেগের বাড়ীতে মৌলবী মজহর আলী থাকেন। আমার এবং ওঁর বাড়ীর মাঝে শুধু মীর খৈরাতীর বাড়ী। ডাককে কেউ কখনো আটকায় না। পরামর্শ দিচ্ছি, যদি এই চিঠিটা পড়ে রওনা দেন তাহলে ঈদ্ এখানেই করবেন।

মে, ১৮৫৮

৪৩

তোমার চিঠি পেয়ে সেই রকম আনন্দ হ'ল যে রকম কোনো বন্ধুকে দেখে হয়। কিন্তু যুগ এমন এসেছে ভাই যে, আমার কপালে আনন্দই নেই। চিঠি থেকে জানলাম যে আড়াইশো দিয়েছে। এই দুর্দিনে আড়াই টাকাই বিরাট বস্তু সেখানে আড়াইশো! সুভান আল্লাহ্। এই খালি হাত সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে টাকা গেল যাক্। জান্ মান বাঁচল। এখন মীর সরফরাজ হুসেনের উচিত আলবর চলে যাওয়া। হয়ত নতুন চাকরী পেতে পারে। পেন্সনের ব্যাপারে কিছু জানলে বলবো! হাকিম নিজে চিঠির উত্তর লেখেন না। কর্মচারীদের কিছু জিজ্ঞাসা করে আমাদের চিঠির কি হ'ল, উত্তর দেয় না। তার মোট কথা একটু শুনেছি, যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে আমি নিরপরাধ এবং ডেপুটি কমিশনার সাহেবের পেন্সন সংক্রান্ত রায় আমার দিকেই। ব্যস্ এর থেকে বেশী জানি না, কেউ জানেও না।

কি বলছ মির্যা? আমি বই ছাপাব কোথেকে? খাবার রুটি জোটে

না, পান করার শরাব নেই, শীত আসছে লেপ তোষকের চিন্তায় মাথা খারাপ। বই ছাপাব কোথেকে? মুন্সী উমেদসিং ইন্দোরবালা দিল্লী এসেছিলেন। আমার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না। এক বন্ধু ওঁকে আমার ঘরে নিয়ে আসে। উনি লেখাগুলো দেখে ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আগ্রায় আমার শিষ্য ও বন্ধু মুন্সী হরগোপাল তফ্‌তা থাকেন। আমি ওঁকে লিখেছিলাম। ব্যাপারটা নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন। লেখাগুলো পাঠান হ'ল। প্রতি কপির দাম আট আনা স্থির হয়েছে। পঞ্চাশ কপি মুন্সী উমেদসিং নেবেন। পঁচিশ টাকার হুণ্ডি প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুন্সী হরগোপাল তফ্‌তার চেষ্টায় ছাপা শুরু হয়েছে। আগ্রার শাসনকর্তাকে দেখানো হয়েছে এবং অনুমতি চাওয়াতে উনি অত্যন্ত খুশী হয়ে অনুমতি দিয়েছেন। পাঁচশো কপি ছাপা হচ্ছে। বোধহয় পঁচিশ কপি মুন্সী উমেদসিং আমাকে দেবেন। আমি প্রিয়জনদের মধ্যে বিলি করব। পরশু তফ্‌তার চিঠি এসেছে, উনি লিখেছেন এক ফর্মা ছাপা বাকী আছে। মনে হয় এই অক্টোবরের মধ্যেই হয়ে যাবে। ভাই, আমি ১৭৫৭'র এগারো মে থেকে ২১শে জুলাই ১৭৫৭ অবস্থার কথা লিখেছি। আমানুদ্দিন খাঁর জায়গীর পাওয়ার কথা এবং বাদশাহের রওনা হওয়ার কথা কি ভাবে লিখতাম? জায়গীর পেয়েছেন আগস্টে, বাদশাহ অক্টোবরে গেছেন। বাদ দেওয়া ছাড়া আর কি করার ছিল বলো? মুন্সী উমেদসিং ইন্দোর চলে যাচ্ছিলেন; যদি শেষ করে লেখাগুলো ওঁর সামনে আগ্রায় না পাঠাতাম তাহলে কে ছাপাতো বলো?

অক্টোবর, ১৮৫৮

৪৪

বাহ্ বাহ্ !

তুমি তো গদ্যে অভিমান শুরু করেছ হে ! কয়েকদিন থেকে তোমার চিঠির উত্তরের চিন্তায় আছি। কিন্তু শীত আমাকে কজ্জা এবং অচল করে দিয়েছে। আজ আকাশময় সেই অকারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডাটা নেই তাই চিঠি লিখতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু ভাবছি কি ম্যাজিক দেখাই, কি কাব্য করা যায়। ভাই, তুমি তো উর্দু'র মির্জা কতীল হয়ে গেছ। উর্দু বাজারের খালের ধারে থাকতে থাকতে নীল নদী হয়ে গেছে। কি কতীল, কি নীল নদী, এ সবই হাসি ঠাট্টার কথা হ'ল। নাও শোনো এখন তোমার দিল্লীর কথা শোনো। চৌকের বেগমবাগের দরজার সামনে, চৌবাচ্চার পাশে যে কুঁয়োটা ছিল তা ছাই, মাটি, পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বল্লীমারোর দরজার পাশে বেশ কয়েকটা দোকান ভেঙ্গে ফেলে রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। শহরের জনসাধারণের কথা বিশেষ আর কি ! পেন্সন-ধারীদের সঙ্গে সরকারের কোনো যোগাযোগ নেই। তাজমহল, মির্জা কৈসর, মির্জ্জা জবাবখ্‌ত'এর শালা ওলায়ত আলী বেগ, জয়পুরের জোজা, এদের এলাহাবাদ থেকে মুক্তির আদেশ হয়ে গেছে। বাদশাহ্ মির্জা জবাবখ্‌ত, মির্জ্জা আব্বাস শাহ্ জীনতমহল কলকাতা পৌঁছে গেছেন। এবং সেখানে জাহাজে চেপেছেন। এখানে থাকেন না লণ্ডনে যান। জনগণ এবং সংবাদ-দাতাদের অনুমান মতো শোনা যাচ্ছে বছরের শুরু জানুয়ারী সন ১৮৫৯'এ শহরে লোক বসানো হবে এবং পেন্সনধারীরা বেশী পয়সা পাবে।

যাই হোক, আজ বুধবার ২২শে ডিসেম্বর। বড়দিন আসছে শনিবার এবং পরের শনিবার জানুয়ারীর প্রথম দিন। যদি বেঁচে থাকি তা হলে দেখতে পাব কি কি হ'ল ? তুমি এই চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি দিও।

প্রাণপ্রিয় সরফরাজ হুসেন, তুমি কি করছ হে ? এবং কিসের চিন্তায় মগ্ন ? এখন কি খবর এবং পরের ইচ্ছেটাও বা কি ?

আশরফ আলী সাহেব, আপনি তো ভবঘুরে মানুষ ছিলেন। পাণিপথে কিভাবে স্থিতু হলেন? কিছু একটা জানাবেন তবে তো জানবো।

মীর নসীরুদ্দিনকে শুধুই দোয়া এবং দেখার অভিলাষ।

মীরণ সাহেব কোথায়? কেউ যাও এবং ডেকে আন হে। হুজরত এলেন?

সেলাম আলেইকুম, মেজাজ ভাল তো? মৌলবী মজহর আলী আপনার চিঠির উত্তর দিয়েছেন কি? যদি পাঠিয়ে থাকেন তবে কি লিখেছেন? আমি জানি যে মীর আশরফ আলী সাহেব এবং সরফরাজ হুসেন কম আর এই নিষ্ঠুর মীর মেহেদী বেশী গুস্তাখী করে আপনার সঙ্গে। কি করি বলুন? আমি কোথায়, আপনি কোথায়। আমি ওখানে থাকলে দেখতাম এরা আপনাদের সঙ্গে কি করে বেয়াদবী করে। ঈশ্বরের কৃপায় যখন এক জায়গায় হাজির হ'ব এর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। হে……হে কি ভাবে এক জায়গায় হ'ব! দেখুন যুগ আরো কি দেখায়। আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ।

২১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৮

৪৫

সৈয়দ সাহেব,

না তুমি আসামী। না আমি অপরাধী। তুমি বিবশ। আমি নিরুপায়। নাও, এখন আমার রাম কাহিনী শোনো। নবাব মুস্তাফা খাঁ সাত বছর কয়েদ হয়েছিলেন। এখন রেহাই-এর হুকুম হয়েছে। শুধু রেহাই-এর হুকুমই এসেছে। জাহাঙ্গীরাবাদের জমিদারী এবং দিল্লীর সম্পত্তির এবং পেন্সনের ব্যাপারে এখনো হুকুম আসেনি। রেহাই-এর পর নিরুপায় হয়ে

উনি মীরাটেই এক বন্ধুর বাড়ীতে আসেন। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে মীরাট গেলাম। ওঁকে দেখে দিন চার থেকে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলাম। যাওয়া আসার তারিখ মনে নেই। তবে আগের হপ্তায় গিয়ে মঙ্গলবার এসেছি। আজ বুধবার ২রা ফেব্রুয়ারী আমার আসা ন'দিন হ'ল। তোমার চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম। চিঠি এলে উত্তর দেব ভাবছিলাম। আজ সকালে তোমার চিঠি এল। দুপুরে উত্তর দিচ্ছি।

"রোজ ইস্ শহরমেঁ এক হুকুম নয়া হোতা হ্যায়
কুছ্ সমঝমেঁ নেহী আতা কি ক্যায়া হোতা হ্যায়।"

মীরাট থেকে এসে দেখি এখানকার আবহাওয়া গরম। গোরা সেনাদের দারোয়ানীতে মায়া-দয়ার স্থান নেই। লাহোরী দরওয়াজার থানা অফিসার মোড়া পেতে সড়কে বসেন। যে গোরা সেনাদের চোখ বাঁচিয়ে আসছে তাকেই ধরে থানায় ভরছে। হাকিমের ওখানে পাঁচ বেত মারা হচ্ছে বা দু'টাকা জরিমানা হচ্ছে এবং আট দিন বন্দী। এছাড়া প্রতিটি থানায় হুকুম হয়েছে, কে বিনা অনুমতিতে আছে এবং কে অনুমতি নিয়েছে তা দেখার। থানায় থানায় বাড়ীর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানকার জমাদর আমার কাছেও এসেছিল। আমি বললাম, "ভাই, আমাকে তোর তালিকার মধ্যে রাখিস না। আমার বক্তব্য, আমার কৈফিয়ত আলাদাভাবে লেখা।" বক্তব্য হচ্ছে, অসদুল্লা খাঁ পেন্সন ভোগী। ১৮৫০ থেকে পাতিয়ালা-বাসী চিকিৎসকের ভাই-এর কাছে আছে। না কেলোদের সময় কোথাও গেছে, না গোরাদের সময় বেরিয়েছে। না তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কর্ণেল ব্রাউন সাহেব বাহাদুরের মৌখিক আদেশই হচ্ছে তার থাকার অধিকার। পরশু এই বক্তব্য জমাদার সদরের নক্‌শাসহ কোতোয়ালীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাল থেকে এই আদেশনামা জারী হয়েছে যে, এই সব লোকেরা শহরের বাইরে ঘর, দোকান কেন বানাচ্ছে? যে সব বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে, ভেঙে দাও। এবং নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে দাও। আর এও শোনা যাচ্ছে পাঁচ হাজার অনুমতিপত্র ছাপা হয়েছে।

আর যে সব মুসলমান শহরে থাকতে চায় তারা নজরানা দিক। সেটার পরিমাণ অবশ্য হাকিম ঠিক করে দেবেন। টাকা দাও অনুমতিপত্র নাও।

বন্ন বরবাদ হয়ে যাক শহরে আবাদ করুন। আজ পর্যন্ত এই অবস্থা, দেখ শহরে বসার মহরত কখন হয়? যারা আছে তাদেরও বের করে দেওয়া হবে, না কি যারা বাইরে পড়ে আছে তারা শহরে আসবে।

প্রাণপ্রিয় সরফরাজ হুসেন এবং মীর নসীরুদ্দিনকে দোয়া এবং জনাব মীরণ সাহেবকে সেলাম এবং দোয়া দু'টোই, যেটা ইচ্ছা স্বীকার করুন।

বুধ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯

৩৬

মেরি জান্,

খোদা তোমাকে একশো কুড়ি বছর আয়ু দিন। বড় হতে চলেছ, দাড়ির চুলে সাদা রং এসে গেছে, কিন্তু কথা বুঝতে পারছ না! পেন্সনের ব্যাপারে শুধু শুধু এত চিন্তা করছ কেন? এটা তো জান দিল্লীর সব পেন্সন ভোগীরা গত ১৮৫৭'র মে মাস থেকে পেন্সন পায়নি। এটা ১৮৫৯ চলছে, ফেব্রুয়ারী মাস। বাইশতম মাস এটা। কিছু লোক এই বাইশতম মাসে একবছরের টাকা সাহায্য স্বরূপ পেয়েছে। বাকী টাকা মাসে মাসে পাওয়ার ব্যাপারে এখনো কিছু হুকুম হয়নি।

আলীবখ্শ খাঁ পঞ্চাশ টাকা পেতেন মাসে, বাইশ মাসে এগারোশো হচ্ছে, উনি ছ'শো টাকা পেয়েছেন। বাকীটা তোলাই থাকল। পরে পাবার কোনো সংবাদ নেই। গুলাম হসন্ খাঁ মাসে এক'শো টাকার পেন্সন ভোগী, বাইশ মাসে বাইশ'শো হচ্ছে। উনি বারোশো টাকা পেয়েছেন। দিওয়ান কিষণলালের মাসে দেড়শো, বাইশ মাসে তিনহাজার তিনশো হচ্ছে, উনি আঠারোশো পেয়েছেন। মওা জমাদারের মাসে দশ টাকা হিসাবে একবছরের একশো কুড়ি টাকা নিয়ে এসেছেন। এ রকম

পনের যোলজন পেয়েছে, আবার কখন পাওয়া যাবে কাউকে কিছু বলা হয়নি। আমি সাহায্য কিছু পাইনি। বেশ কয়েকটা চিঠি লেখার পর শেষ চিঠিতে কমিশনার সাহেব হুকুম দিয়েছেন, ভিখারীকে একশো টাকা সাহায্য দেওয়া হোক। আমি ওই একশো টাকা নিই নি। এবং আবার কমিশনার সাহেবকে লিখলাম, আমি মাসে বাষট্টি টাকা আট আনা পেয়ে থাকি, এক বছরে সাড়ে সাতশো টাকা হয়। সব পেন্সন ভোগীদের এক বছরের টাকা দেওয়া হয়েছে, আর আমাকে একশো কেন? অন্যান্যদের মতো একবছরের টাকা দেওয়া হোক। এখনো এর কোনো জবাব পাইনি।

শহরের অবস্থা হচ্ছে ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনুমতিপত্র ছাপিয়ে এজরটন্ সাহেব বাহাদুর কলকাতা চলে গেছেন। দিল্লীর মূর্খরা, যারা বাইরে পড়ে আছে হাঁ করে থেকে গেছে। এখন উনি যখন ফিরে আসবেন তখন বোধ হয় ব্যবস্থা হবে, নয়ত নতুন কিছু হবে।

মীর সরফরাজ হুসেন এবং মীর নসীরুদ্দিন এবং মীরণ সাহেবকে দোয়া।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯।

৪৭

মেরিজান্,

রামকাহিনী শোনো। দিল্লীর কমিশনার সাহেব বাহাদুর অর্থাৎ জনাব স্যাণ্ডার্স সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান। ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আমি গেলাম। সাহেব শিকারে গেছিলেন। আমি ফিরে আসি। শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী আবার গেলাম। দেখা হ'ল, চেয়ার এগিয়ে দিলেন। মেজাজের খবরাখবর নিয়ে চারপাতার একটা ইংরেজী চিঠি পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে আমাকে বললেন, পাঞ্জাবের

জেলা জজ ম্যাকলড্ সাহেব তোমার ব্যাপারে লিখেছেন—এর অবস্থায় খোঁজ নাও। সেইজন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি মাননীয়া রাণীর কাছ থেকে রাজবস্ত্র কেন চাচ্ছ? খুলে বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বইটা কেমন লিখেছ? পরিষ্কার করে বললাম। বললেন, ম্যাকলড সাহেব দেখতে চেয়েছেন এবং আমাকেও একটা দিও। আমি বললাম, কালই হাজির করব। তারপর পেন্সনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাও বললাম। নিজের ঘরে ফিরে এলাম খুশী মনে।

দেখ মীর মেহেদী, পাঞ্জাবের জেলা জজ-এর সঙ্গে বিলাতের মোকদ্দমার কি সম্পর্ক? বই-এর সঙ্গে কি সম্পর্ক? পেন্সনের তদন্তের সঙ্গে কি সম্পর্ক? এটা গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের চাপে হয়েছে। এবং মামলায় জয় হবেই। রবিবার নিজেই ঘরে ছিলাম।

সোমবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী গেলাম। বাইরের ঘরে বসে খবর পাঠালাম। বলে পাঠালেন, ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করতে বলো। কিছুক্ষণ পর গড্ ক্যাপ্টেন-এর চিঠি এল। গাড়ী চেপে বেরিয়ে গেলেন। আমি বললাম, বই এনেছি। বলে গেলেন, মুন্সী জীবনলালকে দিয়ে যাও। উনি ওদিকে বেরিয়ে গেলেন আর আমিও ঘোড়ার গাড়ী চেপে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ১লা মার্চ আবার গেলাম। অত্যন্ত সহানুভূতি নিয়ে কথাবার্তা বললেন। গভর্ণরদের কিছু সার্টিফিকেট নিয়ে গেছিলাম, ওগুলো দেখালাম। ম্যাকলড সাহেব বাহাদুরকে দেবার জন্য একটা চিঠি লিখে নিয়ে গেছিলাম। সেটা দিয়ে প্রার্থনা জানালাম যে, বই-এর সঙ্গে এটাও যেন দয়া করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে চিঠিটা রেখে দিয়ে আমাকে বললেন, আমি তোমার পেন্সনের ব্যাপারে ইজর্টন সাহেবকে লিখেছি। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করো। তুমি তো জানো ইজর্টন সাহেব ছিলেন না। কাল এসেছেন, আজ আমি ওঁকে চিঠি লিখছি। উনি যেমন হুকুম দেবেন আমি সেইরকমই করব। যখন ডাকবেন তখনই যাব। দেখ হে, সৈয়দ অসদুল্লা খাঁ গালিবের ওপর সহানুভূতিটা দেখ। গোলামকে কিভাবে বাঁচাল। বাইশমাস ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্তও থাকতে দেয়নি। উনি আজ সরকারের দাতা, আমার প্রতি কৃপা

করার আদেশ পাঠালেন, সরকারের কাছ থেকে আমাকে সম্মান দেখালেন। আমার ধৈর্য ও সহ্য প্রশংসা পেল। অবশ্য ও দু'টো তাদেরই দান। আমি কি আমার বাবার ঘর থেকে এনেছিলাম?

মীর সরফরাজ হুসেন যাঁকে এই চিঠিটা পড়াবে। ওঁকে এবং দিল্লীর প্রদীপ নসীরুদ্দিনকে এবং মীরণ সাহেবকে দোয়া জানিও।

মার্চ, ১৮৫৯

৪৮

প্রিয় মীর মেহেদী,

কবিতাগুলো কি তুমি দেখেছ? একেবারে আমার চেহারা। বাহ্‌! অদ্ভুত। কবিতাগুলো ওখানে পাঠাবার সময় একটা চিঠিও দেবার কথা মনে হ'ল। ছেলেরা জ্বালাতন করতে লাগলো—দাদাজান, চলো, খাবার দেওয়া হয়েছে। আমাদের খিদে পেয়েছে। আরো তিনটে চিঠি লিখে রেখেছিলাম। ভাবলাম এখন আর কেন? সেই চিঠি খামে ভরে টিকিট লাগালাম, ঠিকানা লিখে কলহানের হাতে দিয়ে ঘরের ভেতর গেলাম। একটা মজাও ছিল—দেখি আমার মীর মেহেদী অসন্তুষ্ট হয়ে আর কি কথা তৈরী করে? ঠিক তাই হ'ল। তুমি মনের বুদ্বুদ কাটালে, নাও এখন বলো, চিঠি লিখতে বসেছি, কি লিখি? এখানকার অবস্থা, মীরণের কথা, শুনেছ নিশ্চয়। কিন্তু তুমি যেসব শুনেছ ওগুলো আসল কথা নয়। পেন্সনের মামলা কলকাতায় গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষায়······

এই পর্যন্ত লিখেছি। দু'একজন এসে গেল। দিনের আলোও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমি বাক্স প্যাঁটরা বন্ধ করে বাইরে তক্তার ওপর এসে বসলাম। সন্ধ্যে হ'ল। আলো জ্বলল। মুন্সী সৈয়দ আহমদ হুসেন

মাথার গোড়ায় মোড়ার ওপর বসে। আমি শুয়ে আছি। আচমকা পণ্ডিত এবং জ্ঞানীবংশের ছেলে সৈয়দ নসীরুদ্দিন এল। হাতে একটা চাবুক, সঙ্গে একজন লোক। তার মাথায় একটা টুকরী। তার ওপর সবুজ ঘাস আমি বললাম, আহা—হা—বিদ্বানদের সম্রাট মৌলানা সরফরাজ হুসেন দহেলভী দ্বিতীয়বার রসদ পাঠিয়েছেন। পরে জানলাম, 'তা নয়'—অন্যকিছু। একটা মজার জিনিস—আম। শরাব নয়—আম। এক একটা আমকে লিকারভর্তি মুখবন্ধ গেলাসের মতো মনে হচ্ছিল। কিন্তু বাহ্, এমন ভঙ্গিতে ভরা যে পঁয়ষট্টিটা গেলাস থেকে একটা বিন্দুও পড়েনি। মিয়াঁ বলছিল আশীটা ছিল। পনেরটা পচে যাওয়ার জন্য টুকরী থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, ভাই, এটাই বা কি কম? আমি কিন্তু তোমার কষ্ট এবং সৌজন্যতায় খুশী হইনি। তোমার কাছে পয়সা নেই আম কিনতে গেলে কেন?

লিকার একটা ইংরেজী শরাব। মজাদার স্বাদ এবং রং আহা—হা—এতে এত মিঠে মজা। যেমন কন্দ্-এর পাতলা রস ঠিক তেমনি। এই ভাষার মানে তুমি কোনো শব্দকোষে পাবে না তবে হ্যাঁ সরভী'র শব্দকোষে পেলেও পেতে পার। সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসক ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। যিনি টাকা টাকার বই চাল্লিশ পঞ্চাশটা কিনে নিয়ে গেছেন তাঁকে আমার দোয়া জানিও।

জুন ১৮৫৯

৪৯

ভাই,

না কাগজ, না টিকিট, কিছুই নেই। আগের খামগুলোর মধ্যে একটা রংচটা খাম পড়ে আছে। খাতা থেকে এই কাগজ ছিঁড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। এবং রংচটা খামে ভরে পাঠাচ্ছি। রাগ করো না। কাল বিকেলে আশাতীত কিছু এসে গেছে। আজ কাগজ ও টিকিট আনাব।

৮ নভেম্বর রবিবার, বিকালবেলা যাকে জনসাধারণ 'বড়ী ফজর' বলে থাকেন। পরশু তোমার চিঠি পেয়েছি। আজ তোমাকে চিঠি লিখতে মন চাইতেই কয়েক লাইন লিখে ফেললাম।

মীর নসীরুদ্দিনকে মুবারক ওর মেয়ের জন্য। ভাই, নামধাম আমি আর কি খুঁজব? হ্যাঁ। 'অজীম উন্নিসা বেগম' ভাল নাম। তাছাড়া এ নামের একটা ঐতিহ্য আছে। শাহ্ মুহম্মদ অজীমসাহেব রহমতুল্লা অলৈ'র নামের জন্য।

শহরের অবস্থা আমি কি জানি? শোনা যাচ্ছে 'পৌলটুটা' নামে কোনো কিছু জারী করা হয়েছে। আনাজপত্তর ছাড়া এমন কিছু নেই যার ওপর জারী হয়নি। জামা মসজিদের পাশে পঁচিশ, পঁচিশ ফিট গোল মাঠ তৈরী হবে। দোকান, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হবে। অবিনশ্বর স্থান নশ্বর হয়ে যাবে। শুধু বাকী আল্লাহ্'র নাম। খানচাঁদের গলি, শাহ্ বোলা'র গড় পর্যন্ত ভাঙ্গা হবে। দু'দিক থেকে ফাওড়া চলছে। বাকী সব কুশল।

প্রধান বিচারকের আসার কথা শোনা যাচ্ছে। দেখ দিল্লী আসেন কিনা। এলে দরবার করেন কিনা। দরবার করলে এই অপরাধীকে ডাকা হয় কিনা। নিমন্ত্রিত হলে রাজবস্ত্র পাব কিনা। পেন্সনের ব্যাপারে কোথাও কোনো খবর নেই, কেউ কোনো খবরও জানে না।

৮ নভেম্বর, ১৮৫৯ — গালিব

ভাই,

কি, জিজ্ঞেস করছো ? কি লিখি ? দিল্লীর অস্তিত্ব কতগুলো ঘটনার ওপর নির্ভর করে ছিল : কেল্লা, চাঁদনীচক, হররোজা বাজার, জামা মসজিদ, যমুনার পুলে প্রতি সপ্তাহে বেড়াতে যাওয়া। প্রতি বছর ফুলওয়ালাদের মেলা। এই পাঁচটা ব্যাপারই যখন নেই তখন বলো দিল্লী কোথায় ? হ্যাঁ, এই হিন্দুস্থানে দিল্লী নামে একটা শহর ছিল।

গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর ১৫ ডিসেম্বর এখানে প্রবেশ করবেন। দেখ, কোথায় নামেন, কি ভাবে দরবার করেন। আগের দরবারে সাতজন জায়গীরদার ছিলেন, যাদের আলাদা-আলাদা দরবার হ'ত। ঝজ্জর, বাহাদুরগড়, বল্লভগড়, ফরুখনগর, দোজনা, পতৌদি, লোহারু। চারটে শেষ হয়ে গেছে। যারা বাকী আছে ওদের মধ্যে দোজনা ও লোহারু সরকারের অধীনে। হাঁসিহাসর, পতৌদি এখানে আছে। যদি হাঁসিহাসরের কমিশনার ওই দু'জনকে নিয়ে আসেন তাহলে রইল তিনজন, নাহলে একজন রঈস, ব্যস্, থাকল শুধু দরবারের সাধারণ মহাজনরা। সবাই হাজির। মুসলমানদের মধ্যে তিনজন বাকী। মীরাটে মুস্তফা খাঁ, সুলতানজীতে মৌলভী সদরুদ্দিন বল্লীমারোঁতে পৃথিবীর কুকুর, নাম অসদ্। তিনজনই অভাগা। দুজনে বঞ্চিত এবং দুখী —

"তোড বৈঠে জব্ কি হম্ জাম-ও-সবু ফির হমকো ক্যায়া
আসমাঁ সে বাদা-এগুলফাম বরষা করে কোঈ।"

তুমি আসছ এস। জাঁনিসার খাঁ'র সড়ক, খানচাঁদের গলির রাস্তা দেখে যাও। বুলাকী বেগমের গলির ধ্বংসাবশেষ এবং জামা মসজিদের পাশে সত্তর সত্তর গজ গোল ময়দান দেখে যাও। ভগ্ন হৃদয়, দুখী গালিবকে দেখে যাও।

সমসাময়িক যুগের মহান ব্যক্তি মীর সরফরাজ হুসেনকে দোয়া। দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হকীম মীর অশরফ আলীকে দোয়া। কুতুব-উল্-মুল্ক মীর নসীরুদ্দিনকে দোয়া। ইউসুফ-এ-হিন্দ্ মীর আফজল আলিকে দোয়া।

২রা ডিসেম্বর, ১৮৫৯

৫১

"বেময় ন কুনদ্ দর কফ-এ-মন্ খামা-রওয়ানী
সর্দ অস্ত্ হওয়া, আতিশ-এ-বেদুদ। কুজাই?"

—শরাব ছাড়া আমার হাতের কলম চলছে না। ধোঁয়াহীন আগুন কোথায় তুই?

সকালবেলা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। আগুনের পাত্রটা সামনে রাখা। দু'চারটে অক্ষর লিখছি আর আগুনের সেঁক নিচ্ছি। আগুনে উষ্ণতা আছে ঠিকই, কিন্তু হায়! সেই আগুন কোথায় যার দু'ফোঁটা ভেতরে যেতেই শিরা উপশিরায় ছুটে ছুটে যায়। মন নেচে উঠে, মাথা সাফ্। স্বর্গের সাকীর বান্দা তৃষিত! কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!

মির্যা, তুমি কি যে পেন্সন, পেন্সন করে চেল্লাচ্ছ? গভর্ণর জেনারেল কোথায় আর পেন্সনই বা কোথায়? ডেপুটি কমিশনার সাহেব, কমিশনার সাহেব, লেফট্যাণ্যাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর যখন উত্তর দেননি, তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আপীল করা ছাড়া উপায় নেই।

আমার চিন্তা দরবারের সম্মান এবং রাজবস্ত্রের জন্য। আর তোমার পেন্সনের জন্য! এখানকার হাকিম আমার নাম দরবারের তালিকায় লেখেন নি। আমি এ ব্যাপারে লেফট্যান্যাণ্ট-এর কাছে অভিযোগ পেশ করেছি। দেখা যাক কি হয়। মোট কথা, যাই হোক তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব।

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৫৯

৫২

ছেলেমানুষ মির্যা,

কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? এদিকে এস। খবরাখবর শোনো। লাট সাহেবের দরবার মীরাটে হয়েছে। দিল্লী এলাকার জায়গীরদার কমিশনার সাহেবের আদেশ মত মীরাটে গিয়ে পুরাণো নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষাত করে

এসেছেন। শুক্রবার ২৯শে ডিসেম্বর দুপুরের দিকে লাটসাহেব এখানে পৌঁছালেন। কাবলী দরওয়াজার দুর্গ প্রাচীরের তলে ডেরা হ'ল। সেই সময় তোপের আওয়াজ শুনেই আমি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে বসলাম। কেরাণীর সঙ্গে দেখা করলাম। তার তাঁবুতে বসে সেক্রেটারী সাহেবের কাছে খবর পাঠালাম। জবাব এল, সময় নেই। এই জবাব শুনে নিরাশার পোঁটলা বেঁধে চলে এলাম। যদিও পেন্সনের ব্যাপারে কদাপি স্বীকার, অস্বীকার নয়। কিন্তু কিছু ভাবনায় পড়ে গেছি। দেখ কি হয়। লাটসাহেব কাল বা পরশু ফিরে যাবেন। এখানে কোনোরকম কথাবার্তা সম্ভব নয়। লেখনী ডাকেই পাঠান হবে। কি চেহারা সামনে ফুটে ওঠে দেখা যাক।

মুসলমানদের সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার সাধারণ হুকুম হয়েছে। যারা ভাড়া খেয়েছে, তাদের ভাড়া মাফ হয়েছে। আজ সোমবার ১লা জানুয়ারী সন ১৮৬০ হিজরী, দুপুরে তোমাকে চিঠি লিখছি। উচিত মনে করলে এস। নিজের সম্পত্তি দখল করো। এখানে থাকলে থাকতে পার বা চলে যেতে পার।

মীর সরফরাজ হুসেন, মীর নসীরুদ্দিন, মীরণ সাহেবকে দোয়া জানাবে এবং হকীম মীর অশরফ আলিকে দোয়ার পর বলো, সে যে নির্য্যাস পাঠিয়েছিল তার প্রস্তুত প্রণালীটা যেন আমাকে লিখে পাঠিয়ে দেয়।

নিজের মৃত্যুকামী

১লা জানুয়ারী, ১৮৬০ গালিব

৫৩

আহা…হা…। আমার প্রিয় মীর মেহেদী এসেছে। এস ভাই, মেজাজ ঠিক আছে তো? বসো, এটা রামপুর, আনন্দের জায়গা। যে মজা এখানে সে আর অন্য কোথায় পাবে? পানী? সুভান্ আল্লাহ্। শহর থেকে তিনশো পা দূরে একটা নদী আছে, তার নাম কোশী

নিঃসন্দেহে জীবনের নির্ঝরিণীর কয়েকটা স্রোত ওখানে গিয়ে মিশেছে। যাইহোক এরকম হলে তো ভাই অমরত্ব, আয়ু বাড়ায়। কিন্তু এতটা মিঠে কোথায় হবে?

তোমার চিঠি পৌঁচেছে। ব্যর্থ দুশ্চিন্তা। আমার ঘর ডাকঘরের কাছেই এবং ডাকঘরের কেরাণী আমার বন্ধু। ওরফে লেখার প্রয়োজন নাই, বা পাড়া লেখার প্রয়োজন। পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চিঠি পাঠাও, জবাব নাও। এখানকার অবস্থা সবরকমে ভাল এবং সুন্দর। এখনো পর্যন্ত অতিথি। দেখি কি হয়। মান সম্মান যতদূর পাওয়ার পাচ্ছি। ছেলে দু'জন আমার সঙ্গেই এসেছে। এসময় এর থেকে বেশী লিখতে পারছি না।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৫১

৫৪

গালিবের প্রাণ,

তোমার চিঠি পৌঁচেছে। গজল সংশোধনের পর পৌঁচেছে—'হর হক্ সে পুছতা হুঁ ওহ্ কাহাঁ হ্যায়?'

লাইনটা পাল্টে দিলে এই শের-ই কি রকম হচ্ছে দেখ—"এ মীর মেহেদী, তুঝে শরম নেহী আতী"

মিয়াঁ এটা শিল্পীর ভাষা। আরে, এখন দিল্লী, হিন্দুকারিগর বা পৃথিবী-বাসী বা পাঞ্জাবী বা গোরা এদের মধ্যে কার ভাষায় তুমি প্রশংসা করছ? লক্ষ্ণৌবাসীদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি, রাজ্য তো চলে যাচ্ছে। বাকী শুধু প্রতিটি শিল্পের সম্পূর্ণ ব্যক্তিরা।

সেই খসখস, সেই পূর্বদিকের হাওয়া কোথায়? মজা তো সেই বাড়ীটায় ছিল। এখন মীর খৈরাতীর বাড়ীর চারিদিক বদলে গেছে। মোটের ওপর দিনচলা গোছের। মহাবিপদটা হচ্ছে, কাবি'র কুঁয়ো বন্ধ হয়ে গেছে, লালডগীর কুঁয়োটা যেন একটা খোদাই করা পাত। খারীজলই না হয়

খেতাম, এখন গরমজল বেরোচ্ছে। পরশু ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে কুঁয়োগুলোর অবস্থা দেখতে গেছিলাম, জামা মসজিদ্ হয়ে রাজঘাট পর্যন্ত। বাড়িয়ে-চড়িয়ে বলছি না। জামা মসজিদ থেকে রাজঘাটের দরজা পর্যন্ত যেন মরুভূমির কঠিন মাটি। ইঁটের পাহাড় যা পড়ে আছে সেগুলো ওঠানো হয়ে গেলেই একটা ভয়ানক জায়গা হয়ে যাবে।

মনে করো, মির্জা গৌহর-এর বাগানটা। এখন কঙ্কালের সমান হয়ে গেছে। এমনকি রাজঘাটের দরজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গের ফটক ছাড়া বাকী সব বন্ধ। কাশ্মিরী দরওয়াজার অবস্থা তুমিই দেখে গেছ। লোহারু সড়কের জন্য কলকাত্তাদরওয়াজা থেকে কাবলীদরওয়াজা পর্যন্ত মাঠ হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী বস্তি, ধোপাপল্লী, রামজীগঞ্জ, সাদাত খাঁর বস্তী, জার্নেল বিবির হাভেলী, রামজীদাস গোদামবালার বাড়ীঘর, সাহিবরামের বাগান বাড়ী এদের কারো চিহ্ন নেই, সংক্ষেপে বলা যায় শহরটা মরুভূমি হয়ে গেছে। কুঁয়োগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য জল এখন দুষ্প্রাপ্য মোতি। সুতরাং এই মরুভূমি এখন কারবালা মরুভূমি হয়ে যাবে।

আল্লাহ! আল্লাহ! দিল্লীই থাকল না আর দিল্লীবালারা এখনো পর্যন্ত এখানকার ভাষাকে সুন্দর বলে! বারে বিশ্বাসের সৌন্দর্য্য! আরে! খোদার বান্দারা, উর্দুবাজারই থাকল না, উর্দু কোথায়? ঈশ্বরের দিব্যি দিল্লী এখন শহর নয়। ক্যাম্প আর ছাউনী। না দুর্গ না শহর না বাজার না খাল!

আলবরের অবস্থা অন্য রকম। বিপ্লবের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আলেকজাণ্ডার হ্যাডরেলের কোনো চিঠি আসেনি। মনে হয় ওঁর সময় নেই নয়ত চিঠি আমাকে নিশ্চয়ই লিখতেন।

মীর সরফরাজ হুসেন, মীরণ সাহেব এবং নসীরুদ্দীনকে দোয়া।

১৮৬১

৫৫

সৈয়দ সাহেব,

কাল বিকেলের দিকে তোমার চিঠি এল। আশা করছি ঐ সময় বা সন্ধ্যেবেলা মীর সরফরাজ হুসেন তোমার কাছে পৌঁছে গেছে। সফরের বৃত্তান্ত ওর মুখ থেকে শুন। আমি কি লিখব? আমি যা শুনেছি ওর কাছ থেকেই। এইভাবে ওর ফিরে আসা আমার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এবং ভাবনা অনুসারে হয়েছে। আমি জানতাম ওখানে কিছু হবে না। একশো টাকা শুধু শুধু নষ্ট হ'ল। এটা যদি শুধু আমার ভরসায় হয়ে থাকে তাহলে আমিও লজ্জিত। আমার এই ছেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত এই রকম লজ্জা এবং অনেক কলঙ্ক নিয়েছি মাথা পেতে। যেখানে হাজার দাগ আছে সেখানে আর একটি দাগ কিছু না। মীর সরফরাজ হুসেনের অসাফল্য আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

মহামারীর কথা কি আর জিজ্ঞেস করছ? মৃত্যুর তূণে এই একটিই তীর বাকী ছিল। খুন কত সহজ! লুঠ এত কঠিন! কালের হাত কিভাবে এগোল মহামারী? কেন হয় না? লসান উল গৈব দশবছর আগে বলেছেন—'ওহে গালিব, এখন তো সব অভিশাপ কেটে গেছে। এখন তো শুধু দেওয়া-নেওয়া করে মৃত্যুর আগমনই বাকী' সেটাও বলা যায় না কখন আসে. কেননা এটা যদি জেনেই ফেলি অমুকদিন আমার মৃত্যু হবে তাহলে এসব দুঃখ অর্দ্ধেক হয়ে যাবে এই ভেবে যে, 'চলোহে, ওই দিন তো সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।'

মিয়াঁ ১২৭৭-এর কথাটা ভুলছি না। কিন্তু সাধারণ মহামারীতে মরা আমার অপছন্দ, নিঃসন্দেহে এটা আমার অভিমানের দোষ। পরে বিপদের সঙ্গে রফা হয়েছে ভেবে নেওয়া হবে। কুল্লিয়াত এ-উর্দু ছাপা শেষ। আশা করছি এই মাসেই এককপি ডাকে তোমার কাছে পৌঁছাবে। কুল্লিয়াত এ-নজম-এ-ফারসী ছাপারও তদবীর হচ্ছে। দেখ বেরা পার লাগে কিনা, কাতে বুরহান-এর শেষে কিছু বাড়ান হয়েছে। যদি ভাগ্যসহায় হয় তাহলে

আমি শত্রুদের মুখে ছাই দিয়েই ছাপাব। কিন্তু এ কঠিন চিন্তা। আমার ভাগ্যের প্রস্তুতির কথা নিজের সময়ের মহান ব্যক্তি জানে। খোদার বান্দা, আলীর গোলাম, মহামারীর আঁচ কমে গেছে। পাঁচ-সাত দিন অত্যন্ত জোরদার ছিল।

পরশু খাজা আম্মনের ছেলে, খাজা মির্জা বিবিবাচ্চাদের নিয়ে দিল্লী এসেছে আর কালরাত্রে তার ন' বছরের ছেলে কলেরায় মারা গেছে।

১৮৬১

৫৬

ভাই,

আমার আফশোষ এখানে যে, এই অসাফল্য আমার কথার ভরসায় এবং আমার মর্জির বিরুদ্ধে হয়েছে। যেভাবে এ এসেছে যদিও আমার মন এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। তবুও ঈশ্বরের শপথ, আমার বিশ্বাস কল্পনা ও অনুমান অনুসারে হয়েছে অর্থাৎ আমি বলেছিলাম সবশেষে এই হবে।

দীওয়ান-এ-উর্দু ছাপা শেষ। হায়! লক্ষ্ণৌর ছাপাখানা যার, যে দীওয়ান ছেপেছে সে তো আকাশে চড়িয়ে দিয়েছে। চিঠির সৌন্দর্যের চেয়ে অক্ষরকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। দিল্লী, দিল্লীর ছাপাকে ধিক্কার দীওয়ানের মালিককে এইভাবে স্মরণ করো যেন কোনো কুকুরকে ডাকা হচ্ছে। প্রতিটি কপি দেখেছি। প্রুফরীডার অন্যজন ছিল। আর আমার কাছে যে কপি নিয়ে আসত সে অন্য কেউ। এখন দীওয়ান ছাপার পর অধিকারবশত একটা কপি আমি পেয়েছি। মন দিয়ে দেখেছি অক্ষরের ভুল থেকেই গেছে। অর্থাৎ প্রুফরীডারি ঠিক করেনি। লেখার সময় যে ভুল ছিল তাই রয়ে গেছে। যাইহোক খুশী হই বা না হই কয়েকটা কপি কিনে নেব। যদি ঈশ্বর চান এই হপ্তায় তিনকপি প্রথম তিন খলীফার কাছে পৌঁছে যাবে।

আমি খুশী হইনি তুমিও হবে না। আর তুমি যে লিখেছ এখানে গ্রাহক আছে, নাম লিখে পাঠাও।

আমি দালাল নই, ব্যবসাদার নই, প্রেস মালিকও নই। আহমদী প্রেসের মালিক মুহম্মদ হুসেন খাঁ, দিল্লী, রায়মানের গলি. চিত্রকারদের অট্টলিকার পাশে। বই-এর দাম ছ' আনা, ডাকব্যয় গ্রাহকের। বই যারা কিনতে চায় তাদের জানিয়ে দাও। দুই, চার, দশ, পাঁচ কপি যার দরকার মুহম্মদ হুসেনের নামে দিল্লী রায়মানের গলি, চিত্রকারদের বাড়ীর ঠিকানা লিখে ডাকে চিঠি পাঠাও। বই ডাকে পৌঁছে যাবে। নগদ দাম এবং টিকিট পাঠাও। আমারই বা কি তোমারই বা কি? যারা বলবে তাদের এই জবাব দিও।

মহামারী ছিলটা কোথায় যে লিখব এখন কম বা বেশী? ছেষট্টি বছরের এক যুবক আর চৌষট্টি বছরের এক যুবতী এই দু'জনের মধ্যে একজন মরলেও জানতাম মহামারী এসেছিল। ধিক্কার এই মহামারীকে। বৃহস্পতিবার ৮ই আগস্ট'এর অবস্থা কিছুই জানি না। কাল বিকেলে দু'দুটো মোড়া রেখে লোকজন আসার অপেক্ষা করছিলাম, কেউ আসেনি।

৮ই আগস্ট, ১৮৬১ মুক্তিকামী

গালিব

৫৭

জামা মসজিদ খুলে দেওয়া হয়েছে। চিতলী কবরের দিকের সিঁড়ির ওপর কাবাবিরা দোকান করেছে। ডিম, মুর্গী, পায়রা বিক্রী হচ্ছে। দশজন ব্যবস্থাপক ঠিক করা হয়েছে। মির্জা ইলাহীবক্স, মৌলবী সদরুদ্দিন, ফজল অল্লাহ খাঁর ছেলে তফজুল হুসেন খাঁ, এরা তিনজন, আর অন্য সাতজন। সাতই নভেম্বর ১৪ জমাদীউল-অব্বল, শুক্রবার, আবুজফর সরাজুদ্দিন

বাহাদুর শাহ ইংরেজের কয়েদ এবং শরীরের কয়েদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

শীত পড়ছে। আমার কাছে আজকের মতই শরাব বাকী আছে। কাল থেকে রাত্রে ঠাণ্ডা আগুনের পাশে বসে কাটাতে হবে, বোতল-গেলাস বরখাস্ত।

পাতিয়ালার রাজা মারা গেছেন। মহেন্দ্র সিং, ওর ওপর পুত্রবৎ স্নেহ এবং উপাধি ঠিকই আছে। বাস্তবে দেওয়ান নিহালচন্দ্র কাজ করছে। মোটকথা এই রাজ্যের কি হবে, তা গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আসার পর জানা যাবে। উনি ফেব্রুয়ারী মাসে আসবেন। অলবর রাজ্যের অবস্থা পূর্ববৎ। গভর্ণর সাহেবই এর ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ পাতিয়ালা এবং অলবর রাজ্যের ব্যবস্থা সেই সময়ই হবে। বাস্তবে অলবরের এজেন্ট ইম্পে সাহেব দিল্লী হয়ে মীরাট গেছেন। রাজাসাহেব ওঁকে অভ্যর্থনা করতে গেছেন। এখানে অলবরের রাস্তার কোনো এক ঠিকাদার ইম্পে সাহেবকে কিছু বলেছিল। ইম্পে সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, অলবরের ব্যাপারটা পাঁচজনের হাতে। আমি কোনো হুকুম দেব না।

এখন রোদে বসে আছি। ইউসুফ আলী খাঁ এবং লালা হীরাসিং বসে আছেন। খাবার প্রস্তুত। চিঠি শেষ করে খাম বন্ধ করে লোকের হাতে দিয়ে আমি ঘরে যাব এবং ওদিকে একটা দালানে রোদ আসে, ওখানে গিয়ে বসব। হাত মুখ ধোব। ঝোলে ভিজিয়ে রুটি খাব। তারপর হাত ধোব বেসন দিয়ে, বাইরে এসে বসব। তারপর খোদা জানে কে আসবে, কেমন আলাপ আলোচনা হবে।

মীর সরফরাজ হুসেন খাঁ সাহেব এবং জাকির হুসেন মীর অফজল আলী ওরফে মীরণ সাহেবকে দোয়া।

গালিব

৫৮

মীরমেহেদী,

জনাব মীরণসাহেবকে অসলাম আলৈকুম, আদাব বলুন হুজরত। আজ যদি অনুমতি দেন তাহলে মীরমেহেদীকে ওর চিঠির জবাব দিই। হুজুর আমি কি মানা করেছি? আমি তো এইটুকু বলেছিলাম যে, উনি এখন সুস্থ হয়ে গেছেন। জ্বর ছেড়ে গেছে। আমাশয় এখনো ভাল হয়নি, তবে ওটাও ভাল হয়ে যাবে। আমি নিজের প্রতিটি চিঠিতে আপনার হয়ে লিখে দিই। তারপর আপনি কেন কষ্ট করবেন? না মীরণসাহেব, ওর চিঠি অনেকদিন হ'ল এসেছে, ও নিশ্চয়ই আমার ওপর রেগে আছে। উত্তর দেওয়া উচিত ছিল. হজরত ওতো আপনার ছেলের মতো, আপনার ওপর রাগ করবে কেন? ভাই, আমাকে চিঠি দেওয়া কেন বন্ধ করলে তার তো একটা কারণ থাকবে। সুভান আল্লাহ্! সুভান আল্লাহ্!

এই তো হজরত আপনি নিজেই চিঠি লেখা বন্ধ করেছেন আর আমাকে বলছেন তুমি কেন চিঠি লেখা বন্ধ করলে? ঠিক আছে মেনে নিলাম চিঠি দেওয়া বন্ধ করোনি কিন্তু আমি মীরমেহেদীকে চিঠি দিই এটা তোমার পছন্দ নয় কেন? আসলে সত্য ব্যাপারটা হচ্ছে, যখন আপনার চিঠি যায় এবং পড়া হয় তা শুনে আমি আনন্দলাভ করি। এখন আমি ওখানে নেই, আমার ইচ্ছা ওখানে আপনার চিঠি না যায়। আমি শুক্রবার রওনা দেব। আমার রওনা হওয়ার তিনদিন পর আপনি নিশ্চিন্তে চিঠি দেবেন।

বলো মিঁয়া, অনুভূতির খবর নাও। তোমার যাওয়া না যাওয়ায় আমার কি দরকার। আমি বুড়ো, বোকা-সোকা মানুষ, তোমার কথা শুনে ফেঁসে গিয়ে আজ পর্যন্ত ওঁকে চিঠি দিইনি। লাহোল বিলা কুব্বত্।

শোনো মীরমেহেদী সাহেব, আমার কোনো দোষ নেই। নিজের চিঠির উত্তর দাও। জ্বর তো কমেছে। আমাশয় ভাল হওয়ার খবর তাড়াতাড়ি জানাও, খাওয়া দাওয়ার দিকে খেয়াল রেখ, বড়কথা হচ্ছে ওখানে খাবার

তো কিছু পাওয়া যায় না। তোমার মেনে চলা যদি হয়ও তাহলে ইসমত্‌ বিবি অনাবৃত হবেন। এখানকার অবস্থা, বিস্তারিত মীরণসাহেবের মুখেই শুনবে।

শুক্রবার রওনা যদি দিই এবং পৌঁছে যাই তাহলে ওঁকে জিজ্ঞেস করো, 'জনাব, ইংল্যাণ্ডের রাণীর জন্মদিনের মেহফিলের রোশনীতে তোমার কি খাতির হয়েছে আর এও জেনে নিয়ো যে বিখ্যাত ফারসী প্রবাদ 'দপ্তর রাগা ও খুর্দ' এর কি অর্থ, আর যতক্ষণ না বলেন ছেড় না।

কিছুক্ষণ আগে ঝড় হ'ল। এখন জমাট মেঘ। বৃষ্টি হচ্ছে। আমার চিঠি লেখা শেষ। ঠিকানা লিখে ছেড়ে দেব। ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি বন্ধ হলে কলহাণ ডাকে দিয়ে আসবে। মীর সরফরাজ হুসেনকে দোয়া, আল্লাহ, আল্লাহ! তুমি পাণিপথের বিদ্বানদের সম্রাট ও মহানব্যক্তি হয়ে গেছ। বলো ওখানকার লোকেরা তোমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ বলছে কিনা। মীর নসীরুদ্দিনকে দোয়া জানাবে

৫৯

কেমন আছ মিয়াঁ? কি চিন্তা করছ? কাল বিকেলে মীরণসাহেব রওনা হয়ে গেছেন। এখানে ওঁর শ্বশুর বাড়ীতে ঘটনা কি হয়নি বলো? শাশুড়ী, শালীরা এবং বিবি কান্নার নদী বইয়ে দিয়েছে। শাশুড়ী মহাশয়া বারবার আশীর্বাদ করেছেন। শালীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে শুভ কামনা করেছে। বিবি দেওয়ালের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল। চীৎকার করে কেঁদে উঠতে মন চেয়েছিল কিন্তু নিরুপায় হয়ে চুপ করে থেকে গেছে। ওটাই যথেষ্ট যে শহর ফাঁকা, কোনো চেনা পরিচিত নেই, নয়ত প্রতিবেশীদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে যেত। প্রতিটি লোক নিজের ঘর থেকে দৌড়ে আসত।

অষ্টম ইমাম হজরত আলী মুসা রজা'র ছাপযুক্ত টাকা হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। এগারো টাকা রাস্তা খরচ দেয়। কিন্তু আমি জানি মীরণসাহেব সংরক্ষিত পবিত্র টাকা রাস্তাতেই নিজের হাত থেকে খুলে নেবেন এবং তোমাকে বলবেন শুধু পাঁচ টাকা দিয়েছে। এখন সত্যি মিথ্যা তুমি ধরতে পারবে। দেখবে মীরণসাহেব একটাকা তোমার কাছে লুকোবেন এবং তার থেকেও একটা বড় কথা আছে যা এখন বিবেচনাধীন। গরীব শাশুড়ী সঙ্গে অনেক জিলাপী আর প্রচুর কলাকন্দ্ দিয়েছেন এবং মীরণ সাহেবের মনের ইচ্ছা যে জিলাপীগুলো রাস্তাতেই সাফ করে কলাকন্দ্ তোমার জন্য রেখে কৃতজ্ঞতা দেখাবেন, "ভাই আমি দিল্লী থেকে এলাম, তোমার জন্য কলাকন্দ্ এনেছি।"

কখনো বিশ্বাস করো না, মুফতের মাল মনে করে নিয়ে নিও। কে গেছে, কে এনেছে। কল্লু, আয়াজের মাথার ওপর কোরাণ রাখ। কলহাণের হাতে গঙ্গাজল দাও, উপরন্তু আমিও কসম খাচ্ছি যে এই তিনজনের মধ্যে কেউ আসেনি। ঈশ্বরের শপথ মীরণসাহেব কাউকে দিয়ে আনান নি। আর শোনো মৌলবী মজহর আলী সাহেব লাহোরী দরওয়াজার বাইরে সদরবাজার পর্যন্ত ওঁকে এগিয়ে দিয়ে এসেছেন। এখন বলো ভাই, কে ভাল, কে খারাপ। মীরণসাহেবের এই নরম মেজাজ মজাটাই নষ্ট করে দিয়েছে। এরা ওর জন্য প্রাণ দেয়। মেয়েরা প্রেমিকার জাত, পুরুষকে ভালবাসে। মৌলানা সরফরাজ হুসেনকে আমার দোয়া জানাবে এবং বলো, হজরত আমি তোমাকে দোয়া জানিয়েছি এবং তুমি আমাকে দোয়া জানাবে। মিঁয়া, কিসে ফেঁসে আছ হে? ইসলামী আইন পড়ে কি হবে? আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন পড়। যাতে মানুষ হতে পার।

৬০

মীর মেহেদী, তুমি আমার অভ্যাসের কথা ভুলে গেছ। জামা মসজিদে পবিত্র রমজান মাসের রাত্রের নামাজ পড়তে কি কখনো কামাই করেছি? এই মাসে রামপুরে কেন থাকব? নবাব সাহেব আসতে মানা করেছিলেন এবং বরষার আমের লোভও দেখান, কিন্তু ভাই আমি ওসবে কর্ণপাত না করে রওনা দিই এবং চাঁদরাত্রে এখানে এসে পৌঁছাই। সোমবার পবিত্র মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সেদিন থেকে প্রত্যেকদিন সকালে হামিদ আলা-খাঁ'র মসজিদে গিয়ে জনাব মৌলবী জফর আলী সাহেবের কোরাণপাঠ শুনি, রাত্রে জামা মসজিদে গিয়ে রাত্রের নামাজ পড়ি। কখনো ইচ্ছা হলে ইফতারের সময় মেহেতাব বাগে গিয়ে রোজা খুলি এবং ঠাণ্ডাজল পান করি। বাহ্! বাহ্! কি সুন্দরভাবে জীবনটা কাটছে। এখন আসল কথা শোনো। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম। ওখানে ওরা আমাকে অতিষ্ঠ করে তোলে, ওদের একা পাঠিয়ে দেবার কথা ভেবেও পারিনি। খোদা জানেন কপালে জীবনভর দুর্নাম পাছে জোটে সে কারণে তাড়াতাড়ি চলে আসি। নয়ত গ্রীষ্ম, বরষা ওখানেই কাটত। জীবিত থাকার শর্ত অনুযায়ী বরষার পর যাব এবং বহুদিন এখানে আসব না। সিদ্ধান্ত মতো নবাব সাহেব জুলাই ১৮৫৯ থেকে, যার এটা দশম মাস, একশো টাকা মাসিক এবং আরো জানিয়েছেন যে রামপুরে থাকলে দুশো পাব আর দিল্লীতে থাকলে একশো। ভাই, শ'দুশো টাকায় কবিতা হয় না। কাব্য করি এজন্য যে নবাব সাহেব আমাকে বন্ধু মনে করেন। চাকর-বাকর মনে করেন না, দেখা-সাক্ষাতে বন্ধুর মতো মনে করেন। বন্ধুর মতো আলিঙ্গন দেন, সম্মান করেন। অন্নদাতার কাছে এ ধরণের ব্যবহার পেতে হলে ভাগ্য থাকা চায়। 'নেই' বলে কোনো অভিযোগ নেই। ইংরেজ সরকার থেকে দশহাজার টাকা বছরে স্থির হয়েছে। তার থেকে আমি পাব বছরে সাড়ে

সাতশো। তিন হাজার বছরে! সম্মান সেরকম পেয়েছি যা রঈসরা পেয়ে থাকেন। এখনো সেই রকমই।

খান্ সাহেবের বন্ধুত্ব, রাজবস্ত্র, পাগড়ী। পাগড়ীর অলঙ্করণ, মোতির হার, বাদশাহ বরাবর স্নেহ করতেন। বক্‌শী, নাজির, হকীম কারো থেকে সম্মান কম নয়, কিন্তু লাভ সেই সামান্য।

মেরিজান্, এখানেও সে রকম ব্যাপার। ঘরে বসে আছি, টাট দেওয়া, হাওয়া আসছে। হুঁকো টানছি। আর এই চিঠিটা লিখছি।

তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হ'ল কথা বলে নিলাম। মীর সরফরাজ হুসেন, মীরণসাহেব এবং নসীরুদ্দীনকে এই চিঠিটা পড়াবে, আমার দুয়া জানাবে।

৬১

মেরিজান্, অবসর সময়ে চিঠি লেখাটাও একটা কাজ। কলম দোয়াত নিয়ে বসলাম যদি চিঠি এসে থাকে তাহলে তার উত্তর, না হলে অভিযোগ। শান্তি সম্মানের কথা লিখতে থাকি কাল হকীম মীর অশরফ আলী এসেছিলেন। মাথা মুড়িয়েছেন। আমি বললাম মাথা মোড়ালে যখন তখন দাড়ি রাখ। বললেন, যার কাপড়ই নেই তার আঁচল কোথা থেকে হবে? ভগবানের দিব্যি, দেখার মতো চেহারা হয়েছে। বলছিলেন মীর আহমদ আলী সাহেব এসে গেছেন, ঠিকঠাকই আছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মাঝে মাঝে প্রিয়জনের খবরাখবর শোনার সুযোগ যেন হয়। আমার সেলাম জানাবে এবং অভিনন্দনও জানাবে। খবরদার, ভুল হয় না যেন। তোমার বাজে অভিযোগের জবাব হচ্ছে যে, তুমি সে চিঠিটা আমাকে পানিপথ থেকে

পাঠিয়েছিলে এবং কারণালে রওনা হওয়ার খবর দিয়েছিলে। আমি ঠিক করেছিলাম যে, যখন করণাল থেকে চিঠি আসবে তখন জবাব দেব। আজ রবিবার ১৫ই অক্টোবর সকালবেলা, এখনো পর্যন্ত খাবারও হয়নি। ঠাণ্ডা খেয়ে বসেছিলাম। এমন সময় তোমার চিঠি এল, পড়ে জবাব লিখতে শুরু করলাম। কলহাণ অসুস্থ আয়্যাজকে চিঠিটা দিয়ে ডাকখানা পাঠালাম। বলো, তোমার অভিযোগ সঠিক না বেঠিক। ভাই, অভিযোগ করলে নিজের বিরুদ্ধে করো, কেন না তুমি কারণাল পৌঁছে চিঠি দিতে দেরী করলে কেন? আর হ্যাঁ, এটারই বা কি কারণ যে অনেকদিন থেকে মীর নসীরুদ্দীনের নাম তোমার কলম থেকে বেরোচ্ছে না? শুধু কি নাম, না তার ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করা, না শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এটা তো ঠিক নয়। অন্তত ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

মীরণ সাহেবের ব্যাপারে চিন্তায় আছি। একা তোমার সঙ্গে গেছেন। ওঁর মা পাণিপথে রয়েছেন। ওখানে কোনো ঘর নিয়ে মাকে রেখে নিজেই কিছুদিনের মধ্যে এখানে আসবেন কি? এ প্রশ্নদুটোর জবাব চাই। মীর নসীরুদ্দীনকে সেলাম না লেখার কারণ এবং মীরণ সাহেবের খবরা-খবর বিস্তারিত লিখবে। আমার পেন্সনের কথা আর উল্লেখ কোরো না যদি পাই তোমাকে খবর নিশ্চয়ই দেব। শহরের কথা হচ্ছে যে, ভাড়ায় ঘর পাওয়া যাচ্ছে। চার পাঁচশো ঘর বসতেই সব বন্ধ। এখন খোদা জানেন কি আইন চালু হয়েছে, পরে কি হবে? মৌলবী সৈয়দ সরফরাজ হুসনকে, মীরণ সাহেবকে দুয়া এবং ভালবাসা। মীর নসীরুদ্দীনকে দুয়া। বিশেষ আর কি?